আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম
অধ্যাপক ড. হিমেল বরকত
অধ্যাপক ড. মো. মেহেদী হাসান
ড. মো. জফির উদ্দিন
ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া
ড. প্রকাশ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২০
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ **আনন্দপাঠ** পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অষ্টম শ্রেণির **আনন্দপাঠ** বইটি শিক্ষার্থীদের জন্যে দ্রুতপঠনের পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও তাদের মননতৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে বইখানি প্রণয়ন করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা ভাষার লেখক ছাড়াও বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ সংকলন করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাবে। বইটিতে সংকলিত রচনাগুলো বিষয়ের দিক থেকে একইসঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রসঘন। আশা করা যায়, পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দ যোগাবে এবং চিত্তের বিকাশ ঘটাবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কাকতাড়ুয়া	সত্যজিৎ রায়	১–৭
নয়া পত্তন	জহির রায়হান	৮–১৪
হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি	হাসান আজিজুল হক	১৫–২২
ডেভিড কপারফিল্ড	চার্লস ডিকেন্স রূপান্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	২৩–৩১
মুক্তি	অ্যালেক্স হ্যালি অনুবাদ : গীতি সেন	৩২–৩৮
ফিলিস্তিনের চিঠি	ঘাসান কানাফানি অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯–৪৪
তিরন্দাজ	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৪৫–৫০
নাটক মানসিংহ ও ঈসা খাঁ	ইব্রাহীম খাঁ	৫১–৫৫
ভ্রমণ-কাহিনি কাবুলের শেষ প্রহরে	সৈয়দ মুজতবা আলী	৫৬–৬০

কাকতাড়ুয়া

সত্যজিৎ রায়

মৃগাঙ্কবাবুর সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা প্রমাণ হলো পানাগড়ের কাছাকাছি এসে। গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে গেল। পেট্রোলের ইনডিকেটরটা কিছুকাল থেকেই গোলমাল করছে, সে কথা আজও বেরোবার মুখে ড্রাইভার সুধীরকে বলেছেন, কিন্তু সুধীর গা করেনি। আসলে কাঁটা যা বলছিল তার চেয়ে কম পেট্রোল ছিল ট্যাংকে।

'এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

'আমি পানাগড় চলে যাচ্ছি', বলল সুধীর, 'সেখান থেকে তেল নিয়ে আসব।'

'পানাগড় এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল তিনেক হবে।'

'তার মানে তো দু-আড়াই ঘণ্টা। শুধু তোমার দোষেই এটা হলো। এখন আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

মৃগাঙ্কবাবু ঠান্ডা মেজাজের মানুষ, কিন্তু আড়াই ঘণ্টা খোলা মাঠের মধ্যে একা গাড়িতে বসে থাকতে হবে জেনে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল।

'তাহলে আর দেরি করো না, বেরিয়ে পড়ো। আটটার মধ্যে কলকাতা ফিরতে পারবে তো? এখন সাড়ে তিনটে।'

'তা পারব বাবু।'

‘এই নাও টাকা। আর ভবিষ্যতে এমন ভুলটি কোরো না কখনো। লংজার্নিতে এসব রিস্কের মধ্যে যাওয়া কখনোই উচিত নয়।’
সুধীর টাকা নিয়ে চলে গেল পানাগড় অভিমুখে।

মৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক। দুর্গাপুরে একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয়েছিল মানপত্র দেওয়া হবে বলে। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি, তাই মোটরে যাত্রা। সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন, আর ফেরার পথে এই দুর্যোগ। মৃগাঙ্কবাবু কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাটা তাঁর মতে কুসংস্কার, কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা নিষিদ্ধ বললে তিনি অবাক হবেন না। আপাতত গাড়ি থেকে নেমে আড় ভেঙে তিনি তাঁর চারদিকটা ঘুরে দেখে নিলেন।

মাঘ মাস, খেত থেকে ধান কাটা হয়ে গেছে, চারদিক ধু-ধু করছে মাঠ, দূরে, বেশ দূরে, একটিমাত্র কুঁড়েঘর একটি তেঁতুলগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বসতির কোনো চিহ্ন নেই। আরও দূরে রয়েছে একসারি তালগাছ, আর সবকিছুর পিছনে জমাটবাঁধা বন। এই হলো রাস্তার এক দিক, অর্থাৎ পুব দিকের দৃশ্য।
পশ্চিমেও বিশেষ পার্থক্য নেই। রাস্তা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পুকুর রয়েছে। তাতে জল বিশেষ নেই। গাছপালা যা আছে তা—দু একটা বাবলা ছাড়া—সবই দূরে। এদিকেও দুটি কুঁড়েঘর রয়েছে; কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। আকাশে উত্তরে মেঘ দেখা গেলেও এদিকে রোদ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাকতাড়ুয়া।
শীতকাল হলেও রোদের তেজ আছে বেশ, তাই মৃগাঙ্কবাবু গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা গোয়েন্দাকাহিনি বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

এর মধ্যে দুটো অ্যাম্বাসাডর আর একটা লরি গেছে তাঁর পাশ দিয়ে, তার মধ্যে একটা কলকাতার দিকে। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য থামেনি। মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে বললেন, বাঙালিরা এ-ব্যাপারে বড়ো স্বার্থপর হয়। নিজের অসুবিধা করে পরের উপকার করাটা তাদের কুষ্ঠিতে লেখে না। তিনি নিজেও কি এদের মতোই ব্যবহার করতেন? হয়তো তাই। তিনিও তো বাঙালি। লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনো সংস্কার হয়নি।

উত্তরের মেঘটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এগিয়ে এসে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠান্ডা হাওয়া। মৃগাঙ্কবাবু ব্যাগ থেকে পুলওভারটা বার করে পরে নিলেন। এদিকে সূর্যও দ্রুত নিচের দিকে নেমে এসেছে। পাঁচটার মধ্যেই অস্ত যাবে। তখন ঠান্ডা বাড়বে। কী মুশকিলে ফেলল তাঁকে সুধীর!
মৃগাঙ্কবাবু দেখলেন যে, বইয়ে মন দিতে পারছেন না। তার চেয়ে নতুন গল্পের প্লট ভাবলে কেমন হয়? ‘ভারত’ পত্রিকা তাঁর কাছে একটা গল্প চেয়েছে, সেটা এখনও লেখা হয়নি। একটা প্লটের খানিকটা মাথায় এসেছে এই পথটুকু আসতেই। মৃগাঙ্কবাবু নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে ফেললেন।

নাহ্, গাড়িতে বসে আর ভালো লাগে না।

খাতা বন্ধ করে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর কয়েক পা সামনে এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে তাঁর মনে হলো বিশ্বচরাচরে তিনি একা। এমন একা তিনি কোনোদিন অনুভব করেননি।

না, ঠিক একা নয়। একটা নকল মানুষ আছে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

ওই কাকতাড়ুয়াটা।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় কী যেন একটা শীতের ফসল রয়েছে একটা খেতে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাকতাড়ুয়াটা। একটা খাড়া বাঁশ মাটিতে পোঁতা, তার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে একটা বাঁশ ছড়ানো হাতের মতো দুদিকে বেরিয়ে আছে। এই হাত দুটো গলানো রয়েছে একটা ছেঁড়া জামার দুটো আস্তিনের মধ্য দিয়ে। খাড়া বাঁশটার মাথায় রয়েছে একটা উপুড় করা মাটির হাঁড়ি। দূর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু অনুমান করলেন সেই হাঁড়ির রং কালো, আর তার ওপর সাদা রং দিয়ে আঁকা রয়েছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ-মুখ। আশ্চর্য— এই জিনিসটা পাখিরা আসল মানুষ ভেবে ভুল করে, আর তার ভয়ে খেতে এসে উৎপাত করে না। পাখিদের বুদ্ধি কি এতই কম? কুকুর তো এ ভুল করে না। তারা মানুষের গন্ধ পায়। কাক চড়ুই কি তাহলে সে গন্ধ পায় না?

মেঘের মধ্যে একটা ফাটল দিয়ে রোদ এসে পড়ল কাকতাড়ুয়াটার গায়ে। মৃগাঙ্কবাবু লক্ষ করলেন যে, যে জামাটা কাকতাড়ুয়াটার গায়ে পরানো হয়েছে সেটা একটা ছিটের শার্ট। কার কথা মনে পড়ল ওই ছেঁড়া লাল-কালো ছিটের শার্টটা দেখে? মৃগাঙ্কবাবু অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। তবে কোনো একজনকে তিনি ওরকম একটা শার্ট পড়তে দেখেছেন—বেশ কিছুকাল আগে।

আশ্চর্য—ওই একটি নকল প্রাণী ছাড়া আর কোনো প্রাণী নেই। মৃগাঙ্কবাবু আর ওই কাকতাড়ুয়া। এই সময়টা খেতে কাজ হয় না বলে গ্রামের মাঠেঘাটে লোকজন কম দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু এরকম নির্জনতা মৃগাঙ্কবাবুর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

মৃগাঙ্কবাবু ঘড়ি দেখলেন। চারটা কুড়ি। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা রয়েছে। সেটার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

গাড়িতে ফিরে এসে ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনায় চা ঢেলে খেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শরীরটা একটু গরম হলো।

কালো মেঘের মধ্যে ফাঁক দিয়ে সূর্যটাকে একবার দেখা গেল। কাকতাড়ুয়াটার গায়ে পড়েছে লালচে রোদ। সূর্য দূরের তালগাছটার মাথার কাছে এসেছে, আর মিনিট পাঁচেকেই অস্ত যাবে।

আরেকটা অ্যাম্বাসাডর মৃগাঙ্কবাবুর গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবু আরেকটু চা ঢেলে খেয়ে আবার গাড়ি থেকে নামলেন। সুধীরের আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। কী করা যায়?

পশ্চিমের আকাশ এখন লাল। সেদিক থেকে মেঘ সরে এসেছে। চ্যাপটা লাল সূর্যটা দেখতে দেখতে দিগন্তের আড়ালে চলে গেল। এবার ঝপ করে অন্ধকার নামবে।

কাকতাড়ুয়া।
কেন জানি মৃগাঙ্কবাবু অনুভব করছেন প্রতি মুহূর্তেই ওই নকল মানুষটা তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছে।
সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃগাঙ্কবাবু কতকগুলো জিনিস লক্ষ করে একটা হৃদ্‌কম্প অনুভব করলেন।
ওটার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি?
হাত দুটো কি নিচের দিকে নেমে এসেছে খানিকটা?
দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি আরেকটু জ্যান্ত মানুষের মতো?
খাড়া বাঁশটার পাশে কি আরেকটা বাঁশ দেখা যাচ্ছে?
ও দুটো কি বাঁশ, না ঠ্যাং?
মাথার হাঁড়িটা একটু ছোটো মনে হচ্ছে না?
তিনি কি এই তেপান্তরের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে ভুল দেখছেন ?
কাকতাড়ুয়া কখনো জ্যান্ত হয়ে ওঠে?
কখনোই না।
কিন্তু—
মৃগাঙ্কবাবুর দৃষ্টি আবার কাকতাড়ুয়াটার দিকে গেল।
কোনও সন্দেহ নেই। সেটা জায়গা বদল করেছে।
সেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে।
এসেছে না, আসছে।
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কিন্তু দু পায়ে চলা। হাঁড়ির বদলে একটা মানুষের মাথা। গায়ে এখনো সেই ছিটের শার্ট; আর তার সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে পরা খাটো ময়লা ধুতি।
'বাবু!'
মৃগাঙ্কবাবুর সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। কাকতাড়ুয়া মানুষের গলায় ডেকে উঠেছে এবং এ গলা তাঁর চেনা।
এ হলো তাঁদের এককালের গৃহকর্মী অভিরামের গলা। এদিকেই তো ছিল অভিরামের দেশ। একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। অভিরাম বলেছিল, সে থাকে মানকড়ের পাশের গাঁয়ে। পানাগড়ের আগের স্টেশনই তো মানকড়।
মৃগাঙ্কবাবু চরম ভয়ে পিছোতে পিছোতে গাড়ির সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ালেন। অভিরাম এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। এখন সে মাত্র দশ গজ দূরে।
'আমায় চিনতে পারছেন বাবু?'

মনে যতটা সাহস আছে সবটুকু একত্র করে মৃগাঙ্কবাবু প্রশ্নটা করলেন।

‘তুমি অভিরাম না?’

‘অ্যাদ্দিন পরেও আপনি চিনেছেন বাবু?’

মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে অভিরামকে, তাই বোধহয় মৃগাঙ্কবাবু সাহস পেলেন। বললেন, ‘তোমাকে চিনেছি তোমার জামা দেখে। এ জামা তো আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম।’

‘হ্যাঁ বাবু, আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু শেষে এমন হলো কেন বাবু? আমি তো কোনো দোষ করিনি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন?’

মৃগাঙ্কবাবুর মনে পড়ল। তিন বছর আগের ঘটনা। অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবুদের বিশ বছরের পুরনো গৃহকর্মী। শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা চুরি করে বসে। সুযোগ-সুবিধা দুই-ই ছিল অভিরামের। অভিরাম নিজে অবশ্য অস্বীকার করে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ওঝা ডাকিয়ে কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করিয়ে দেন যে, অভিরামই চোর। ফলে অভিরামকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিরাম বলল, ‘আপনাদের ওখান থেকে চলে আসার পর আমার কী হলো জানেন? আর আমি চাকরি করিনি কোথাও, কারণ আমার কঠিন ব্যারাম হয়। উদুরি। টাকা-পয়সা নাই। না ওষুধ, না পথ্যি। সেই ব্যারামই আমার শেষ ব্যারাম। আমার এই জামাটা ছেলে রেখে দেয়। সে নিজে কিছুদিন পরে। তারপর সেটা ছিঁড়ে যায়। তখন সেটা কাকতাড়ুয়ার পোশাক হয়। আমি হয়ে যাই সেই কাকতাড়ুয়া। কেন জানেন? আমি জানতাম একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার প্রাণটা ছটফট করছিল। –হ্যাঁ, মৃত লোকেরও প্রাণ থাকে–আমি মরে গিয়ে যা জেনেছি সেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম।’

‘সেটা কী অভিরাম?’

‘বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার আলমারির নিচে পিছন দিকটায় খোঁজ করবেন। সেখানেই আপনার ঘড়িটা পড়ে আছে এই তিন বছর ধরে। আপনার নতুন চাকর ভালো করে ঝাড়ু দেয় না, তাই সে দেখতে পায়নি। এই ঘড়ি পেলে পরে আপনি জানবেন অভিরাম কোনো দোষ করেনি।’

অভিরামকে আর ভালো করে দেখা যায় না– সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মৃগাঙ্কবাবু শুনলেন অভিরাম বলছে, ‘এতকাল পরে নিশ্চিন্ত হলাম বাবু। আমি আসি। আমি আসি...’

মৃগাঙ্কবাবুর চোখের সামনে থেকে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘তেল এনেছি বাবু।’

সুধীরের গলায় মৃগাঙ্কবাবুর ঘুমটা ভেঙে গেল। গল্পের প্লট ফাঁদতে ফাঁদতে কলম হাতে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমের মাঠের দিকে। কাকতাড়ুয়াটা যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়িতে এসে আলমারির তলায় খুঁজতেই ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ল। মৃগাঙ্কবাবু স্থির করলেন ভবিষ্যতে আর কিছু গেলেও ওঝার সাহায্য আর কখনো নেবেন না।

লেখক-পরিচিতি

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর পূর্ব-প্রজন্মের ভিটা ছিল কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার মসুয়া গ্রামে। সত্যজিৎ রায় একজন চলচ্চিত্র-নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক ও লেখক। তিনি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের একজন হিসেবে বিবেচিত। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনি লেখক, প্রকাশক ও চিত্রকর। তিনি ছোটোগল্প ও উপন্যাসও রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয় চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

'কাকতাড়ুয়া' গল্পে সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। গল্পে একটি অনুষ্ঠান শেষে ব্যক্তিগত গাড়িতে করে কলকাতা ফিরছিলেন লেখক মৃগাঙ্কবাবু। পথে গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার তেল আনতে যান। এই অবকাশে মৃগাঙ্কবাবুর চোখে পড়ল ধু-ধু মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি কাকতাড়ুয়া। তিনি লক্ষ করলেন কাকতাড়ুয়ার গায়ে পরানো আছে তিন বছর আগে তাড়িয়ে দেওয়া তাঁর গৃহকর্মী অভিরামের লাল-কালো ছিটের শার্ট। ওঝার কথায় মৃগাঙ্কবাবুর বাবা স্বর্ণের ঘড়ি চুরির অভিযোগে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অভিরাম নিজের বাড়িতে এসে অর্থ-কষ্টে ও রোগে মারা যায়। সেই অভিরাম কাকতাড়ুয়ারূপে লেখককে জানায় যে, আলমারির নিচে পিছন দিকটায় ঘড়িটি এখনো পড়ে আছে। আসলে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বাড়ি ফিরে তিনি আলমারির তলা থেকে ঘড়িটা খুঁজেও পেলেন। অভিরামের মাধ্যমে মৃগাঙ্কবাবুর প্রাপ্ত তথ্য সত্যিকার অর্থে অবচেতনে লুকিয়ে থাকা সত্যেরই প্রকাশ। তিনি বুঝতে পারলেন ওঝার কথা ঠিক ছিল না। তাই মৃগাঙ্কবাবু সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে কোনো ওঝার সাহায্য নেবেন না।

কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না, এ সত্যটিই এ গল্পে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অমূলক	– ভিত্তিহীন।
ইনডিকেটর	– নির্দেশক। ইংরেজি Indicator.
ট্যাঙ্কে	– গাড়ির তেল রাখার জায়গা।
লংজার্নি	– দীর্ঘ ভ্রমণ। ইংরেজি Long journey.
রিস্ক	– ঝুঁকি। ইংরেজি Risk.
মানপত্র	– সম্মানসূচক স্মারক।
রিজার্ভেশন	– সংরক্ষণ। ইংরেজি Reservation.
কুসংস্কার	– বিভিন্ন বিশ্বাস যার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ থাকে না।
পাঁজি	– পঞ্জিকা; যেখানে তারিখ, সন, তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা থাকে।
কুঁড়েঘর	– খড়কুটো দিয়ে বানানো ছোটো ঘর।

বসতি	— বসবাসের জায়গা।
অ্যাম্বাসাডর	— এক ধরনের মোটর গাড়ির নাম। ইংরেজি Ambassador
কুষ্ঠি	— নবজাতকের ভবিষ্যদ্‌বাণী লেখা হয় যেখানে।
মজ্জাগত	— জন্মগত।
পুলোভার	— সুতোয় বোনা শীতকালীন জামা।
প্লট	— কাহিনি, ঘটনাক্রম।
নোটবুক	— দরকারি তথ্য টুকে রাখার খাতাবিশেষ। ইংরেজি Note Book.
পয়েন্ট	— বিষয়, প্রসঙ্গ। ইংরেজি point.
বিশ্বচরাচর	— সারা পৃথিবী।
ড্যাবা ড্যাবা	— বড়ো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
সদ্ব্যবহার	— ঠিকভাবে কোনো কিছু ব্যবহার করা বা কাজে লাগানো।
হৃৎকম্প	— হৃদয়ের কম্পন।
মালকোঁচা	— দুই পায়ের মধ্য দিয়ে গোঁজা ধুতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা।
শিহরন	— অনুভূতি।
সেঁটে	— লেগে থাকা।
ভীমরতি	— বয়স বাড়ার কারণে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
ব্যারাম	— রোগ।
উদুরি	— পেটের পীড়া।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. 'পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাটা তাঁর মতে কুসংস্কার।'- কেন? ব্যাখ্যা করো।
খ. মৃগাঙ্কবাবু কেন সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে কোনো ওঝার সাহায্য নেবেন না? বুঝিয়ে লেখো।

২। ক. 'বাঙালিরা এ-ব্যাপারে বড়ো স্বার্থপর।' কোন ব্যাপারে এবং কেন এ কথা বলা হয়েছে?
খ. 'কাকতাড়ুয়া' গল্পের শিরোনাম 'কাকতাড়ুয়া' রাখাটা কতটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নয়া পত্তন

জহির রায়হান

ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।
ন্যুব্জ দেহ, রুক্ষ চুল, মুখময় বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা।
অনেক আশা-ভরসা নিয়েই শহরে গিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কিছু টাকাপয়সা সাহায্য পেলে আবার নতুন করে দাঁড় করাবেন স্কুলটাকে। আবার শুরু করবেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ। কত আশা! আশার মুখে ছাই!

কেউ সাহায্য দিল না স্কুলটার জন্য। না চৌধুরীরা। না সরকার। সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তো রীতিমতো ধমকই খেলেন শনু পণ্ডিত। শিক্ষা বিভাগের বড়ো সাহেব শমসের খান বললেন, রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব। অযথা বারবার এসে জ্বালাতন করবেন না আমাদের। পকেটে যদি টাকা না থাকে, স্কুল বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন। এমনভাবে ধমকে উঠেছিলেন তিনি যেন স্কুলের জন্য সাহায্য চাইতে এসে ভারি অন্যায় করে ফেলেছেন শনু পণ্ডিত।

হেঁট মাথায় সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেও, একেবারে আশা হারাননি তিনি। ভেবেছিলেন সরকার সাহায্য দিল না, চৌধুরী সাহেব নিশ্চয়ই দেবেন। এককালে তো চৌধুরী সাহেবের সহযোগিতা পেয়েই না স্কুলটা দিয়েছিলেন শনু পণ্ডিত।

সে আজ বছর পঁচিশেক আগের কথা—

আশেপাশে দু-চার গাঁয়ে স্কুল বলতে কিছুই ছিল না।

লেখাপড়া কাকে বলে তা জানতই না গাঁয়ের লোক।

তখন সবেমাত্র এনট্রান্স পাশ করে বেরিয়েছেন শনু পণ্ডিত। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে।

চৌধুরীর তখন যৌবনকাল। গাঁয়েই থাকতেন তিনি। গাঁয়ে থেকে জমিদারির তদারক করতেন। অবসর সময় তাস, পাশা আর দাবা খেলতেন বসে বসে। কথায় কথায় গাঁয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছেটা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন শনু পণ্ডিত। জুলু চৌধুরী বেশ আগ্রহ দেখালেন। বললেন, সে তা বড়ো ভাল কথা, গাঁয়ের লোকগুলো সব গণ্ডমূর্খ রয়ে যাচ্ছে। একটা স্কুলে যদি ওদের লেখাপড়া শেখাতে পারো সে তো বড়ো ভালো কথা। কাজ শুরু করে দাও।

টাকাপয়সা খুব বেশি না দিলেও, স্কুলের জন্য একটা অনাবাদি জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন জুলু চৌধুরী। শহর থেকে ছুতোর মিস্ত্রি নিয়ে এসে গুটিকয়েক ছোটো ছোটো টুল আর টেবিলও তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি।

একমাত্র সম্বল দু-টুকরো ধেনো জমি ছিল শনু পণ্ডিতের। সে দুটো বিক্রি করে, স্কুলের জন্য টিন, কাঠ আর বেড়া তৈরির বাঁশ কিনেছিলেন তিনি।

ব্যয়ের পরিমাণটা তাঁরই বেশি ছিল, তবু চৌধুরীর নামেই স্কুলটার নামকরণ করেছিলেন তিনি—জুলু চৌধুরীর স্কুল। আটহাত কাঠের মাথায় পেরেক আঁটা চারকোনি ফলকের ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করত সকাল, বিকেল।

আজো করে।

যদিও আকস্মিক ঝড়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়েছে স্কুলটা। আর তার টিনগুলো জং ধরে অকেজো হয়ে গেছে বয়সের বার্ধক্যহেতু।

স্কুলটা ভেঙে পড়েছে। সেটা আবার নতুন করে তুলতে হলে অনেক টাকার দরকার। শনু পণ্ডিত ভেবেছিলেন, সরকার সাহায্য দিল না, জুলু চৌধুরী নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু ভুল ভাঙল।

সাহায্যের নামে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন জুলু চৌধুরী। বললেন, পাগল, টাকাপয়সার কথা মুখে এনো না কখনো। দেখছ না কত বড়ো স্টাব্লিশমেন্ট। চালাতে গিয়ে রেগুলার হাঁসফাঁস হয়ে যাচ্ছি। আধলা পয়সা নেই হাতে। এদিক দিয়ে আসছে, ওদিক দিয়ে যাচ্ছে।

শনু পণ্ডিত বুঝলেন, গাঁয়ের ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক, তা আর চান না চৌধুরী সাহেব।

কেউই চান না।

না চৌধুরী, না সরকার, কেউ না।

অগত্যা গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ভেঙে পড়া স্কুলটার পাশ দিয়ে আসবার সময় দু-চোখে পানি উপচে পড়ছিল শনু পণ্ডিতের। লুঙ্গির খুঁটে চোখের পানিটা মুছে নিলেন। গ্রামের লোকগুলো উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাঁর অপেক্ষায়। ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল, কী পণ্ডিত, টাকা-পয়সা কিছু দিল চৌধুরী সাহেব?

না, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন শনু পণ্ডিত। চৌধুরীর আশা ছাইড়া দাও মিয়ারা। এক পয়সাও আর পাইবা না তার কাছ থাইকা। সেই আশা ছাইড়া দাও।

পণ্ডিতের কথা শুনে কেমন ম্লান হয়ে গেল উপস্থিত লোকগুলো। বুড়ো হাশমত বলল, আমাগো ছেইলাপেইলাগুলা বুঝি মূর্খ থাইকবো?

তা, আর কী কইরবার আছে কও। আমি তো আমার সাধ্যমতো করছি? আস্তে বলল শনু পণ্ডিত!

বুড়ো হাশমত বলল, তুমি আর কী কইরবা পণ্ডিত। তুমি তো এমনেও বহুত কইরছ। বিয়া কর নাই, শাদি কর নাই। সারা জীবনটাই তো কাটাইছ ওই স্কুলের পিছনে। তুমি আর কী কইরবা।

দুপুরে তপ্ত রোদে তখন খাঁ খাঁ করছিল মাঠ ঘাট, প্রান্তর। দূরে খাসাড়ের মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল কোনো রাখাল ছেলে। বাতাসে বেগ ছিল না। আকাশটা মেঘশূন্য।

সবাইকে চুপচাপ দেখে আমিন বেপারি বলল, আর রাইখা দাও লেখাপড়া। আমাগো বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষে কোনো দিন লেখাপড়া করে নাই। খেতের কাজ কইরা খাইছে। আমাগো ছেইলাপেইলারাও তাই কইরবো। লেখাপড়ার দরকার নাই।

তা মন্দ কও নাই বেপারি। তাকে সমর্থন জানাল মুন্সি আকরম হাজি। লেখাপড়ার কোনো দরকার নাই। আমাগো বাপ-দাদায় লেখাপড়া কারে কয় জাইনতোও না।

বাপ-দাদায় জাইনতোও না দেইখা বুঝি আমাগো ছেইলাপেইলাগুলাও কিছু জাইনবো না। ইতা কিতা কও মিয়া। তকু শেখ রুখে উঠল ওদের ওপর।

শনু পণ্ডিত বলল, আগের জমানা চইলা গেছে মিয়া। এই জমানা অইছে লেখাপড়ার জমানা। লেখাপড়া না জাইনলে এই জমানায় মানুষের কদর অয় না।

তা তোমরা কি কেবল কথা কইবা, না কিছু কইরবা। জোয়ান ছেলে তোরাব আলী অধৈর্য হয়ে পড়ল। বলল, চৌধুরীরা তো কিছু দিব না, তা বুঝাই গেল। আর গরমেন্টো—গরমেন্টোর কথা রাইখা দাও। গরমেন্টোও মইরা গেছে। এহন কী কইরবা, একডা কিছু করো।

হুঁ। কী কইরবা করো। চিন্তা করো মিয়ারা। বিড়বিড় করে বলল শনু পণ্ডিত। বুড়ো হাশমত চুপচাপ কী যেন ভাবছিল এতক্ষণ। ছেলে দুটো আর বাচ্চা নাতিটাকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে স্কুলে দিয়েছিল সে। আশা ছিল আর কিছু না হোক লেখাপড়া শিখে অন্তত কাচারির পিয়ন হতে পারবে ওরা। গভীরভাবে হয়তো তাদের কথাই ভাবছিল সে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলল, যতসব ইয়ে অইছে—যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পরোয়া করি না। না গরমেন্টো। না চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটল হাশমত। বুড়ো হাশমতকে গামছা আঁটতে দেখে জোয়ান ছেলে তোরাব আলীও লাফিয়ে উঠল। বলল, টিনের ছাদ যদি না দিবার পারি অন্তত ছনের ছাদ তো দিবার পারমু একডা। কি মিয়ারা?

হ-হ ঠিক। ঠিক কথাই কইছ আলির পো। গুঞ্জরন উঠল চারদিকে।

হাশমত বলল, মোক্ষম প্রস্তাব। ছনের ছাদই দিমু আমরা। ছনের ছাদ দিতে কয় আঁটি ছন লাইগবো? কী পণ্ডিত, চুপ কইরা রইলা ক্যান। কও না?

কমপক্ষে তিরিশটা লাইগবো। মুখে মুখে হিসাব করে দিল শনু পণ্ডিত। তকু বলল, ঘাবড়াইবার কি আছে, আমি তিনডা দিমু তোমাগোরে।

আমি দুইডা দিমু পণ্ডিত। আমারডাও লিস্টি করো। এগিয়ে এসে বলল কদম আলী।

তোরাব বলল, আমার কাছে ছন নাই। ছন দিবার পারমু না আমি। আমি বাঁশ দিমু গোটা সাত কুড়ি। বাঁশও তো সাত-আট কুড়ির কম লাইগবো না।

হ-হ ঠিক ঠিক। সবাই সায় দিল ওর কথায়।

দু দিনের মধ্যে জোগাড়যন্ত্র সব শেষ।

বাঁশ এল, ছন এল। তার সঙ্গে বেতও এল বাঁশ আর ছন বাঁধবার জন্য।

আয়োজন দেখে আনন্দে বুকটা নেচে উঠল শনু পণ্ডিতের। এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছিল আমিন বেপারি। সবার যাতে নজরে পড়ে এমন একটা জায়গায় গলা খাঁকরিয়ে বলল সে, জিনিসপত্তর তো জোগাড় কইরাছ মিয়ারা। কিন্তুক যারা গতর খাইটবো তাগোরে পয়সা দিবো কে?

হাঁ, তাই তো। কথাটা যেন এক মুহূর্তে নাড়া দিল সবাইকে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন শনু পণ্ডিত। এইডা বুঝি একটা কথা অইল। নিজের কাম নিজে করমু পয়সা আবার কে দিবো? বলে বাঁশ কেটে চালা বাঁধতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, নাও নাও মিয়ারা শুরু করো।

হুঁ। শুরু করো মিয়ারা। বলল তকু শেখ।

স্কুলের খুঁটি তৈরির জন্য লম্বা একটা গাছের গুঁড়ি খালপার থেকে টেনে নিয়ে এল তোরাব। হুঁ, টান মারো না মিয়ারা। টান মারো।

হুঁ। মারো জোয়ান হেঁইয়ো—সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। টান মারো। টান মারো।

আস্তে আস্তে। এত তড়বড় করলে অয়। বলল বুলির বাপ। হুঁ।

কামের মানুষ হেঁইয়ো—আপনা কাম হেঁইয়ো। টান টান।

মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো। হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তোরাব আর তকু।

হাসল সবাই।

খকখক করে কেশে নিয়ে বুড়ো হাশমত বলল, মরা গরমেন্টো কইলানা মিয়ারা? মরা গরমেন্টো কইলা না?

হুঁ। মরা গরমেন্টো হেঁইয়ো। —গরমেন্টোর লাশ হেঁইয়ো। টান টান। করম মাঝি চুপ করে এতক্ষণ। বলল, ফুর্তিছে কাম কর মিয়া সিন্নি পাকাইবার বন্দোবস্ত করিগা।

বাহ্‌বা, মাজির পো, বাহ্‌বা। চালাও ফুর্তি। কলকণ্ঠে চিৎকার উঠল চারদিক থেকে– পাটারি বাড়ির রোগা লিকলিকে বুড়ো কাদের বক্সটাও এসে জুটেছে সেখানে। তাকে দেখে আমিন বেপারি ভ্রূ কুঁচকালো। কী বক্স আলী। সিন্নির গন্ধে ধাইয়া আইছ বুঝি? কয় দিনের উপাস?

যত দিনের অই; তোমার তাতে কী? বেপারির কথায় খেপে উঠল কাদের বক্স। এত দেমাক দেহাও ক্যান মিয়া উপাস ক্যাডা না থাকে? তুমিও থাকো। সক্কলে থাকে।

ঠিক ঠিক। তফু সমর্থন করল তাকে। চৌধুরীরা ছাড়া আর সক্কলেই এক-আধ বেলা উপাস থাকে। এমন কোনো বাপের ব্যাটা নাই যে বুক থাবড়াইয়া কইবার পারব—জীবনে একদিনও উপাস থাকে নাই—হ।

তকু আর কাদেরের কথায় চুপসে গেল আমিন বেপারি।

তোরাব বলল, কী মিয়ারা, কিতা নিয়া তর্ক কর তোমরা। বেড়াটা ধরো। টান মারো।

হুঁ। মারো জোয়ান হেঁইয়ো—চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো—মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। আহ্হারে চৌধুরী রে! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই একসঙ্গে।

আকরম হাজি রুষ্ট হলো এদের ওপর। এত বাড়াবাড়ি ভালা না মিয়ারা। এত বাড়াবাড়ি ভালা না। এহনও চৌধুরীর জমি চাষ কইরা ভাত খাও। তারে নিয়া এত বাড়াবাড়ি ভালা না।

চাষ করি তো মাগনা চাষ করি নাকি মিয়া। তোরাব রেগে উঠল ওর কথায়। পাল্লায় মাইপা অর্ধেক ধান দিয়া দিই তারে।

পাক্কা অর্ধেক। বলল কাদের।

সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি হয়ে গেল স্কুলটা।

শেষ বানটা দিয়ে চালার ওপর থেকে নেমে এলেন শনু পণ্ডিত।

লম্বা স্কুলটার দিকে তাকাতে আনন্দে চিকচিক করে উঠল কর্মক্লান্ত চোখগুলো। সৃষ্টির আনন্দ।

কদম আলী বলল, গরমেন্টোরে আর চৌধুরীরে আইনা একবার দেখাইলে ভালা অইবো পণ্ডিত। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি আমরা।

হ-হ। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি। ঘাড় বাঁকাল শনু পণ্ডিত।

একটু দূরে সরে গিয়ে বটগাছের নিচে বসতেই কাঠের ফলকটার দিকে চোখ গেল তকু শেখের। আট-হাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলক। তার ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করে সকাল বিকেল।

ওইটা আর এইহানে ক্যান? বলল তকু শেখ। ওইটারে ফালাইয়া দে খালে; চৌধুরী খালে ভাসুক। হঠাৎ কী মনে করে আবার নিষেধ করল তোরাব। থাম—থাম—ফালাইস না। ইদিকে আন। কালো চারকোনি ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেলল তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কল্কে থেকে একটা কাঠকয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কী যেন লিখল সে ফলকটার ওপর।

শনু পণ্ডিত জিরোচ্ছিল বসে বসে। বলল, ওইহানে কী লেইখবার আছ আলীর পো। কিতা লেইখবার আছ ওইহানে?

পইড়া দেহ না পণ্ডিত, আহ পইড়া দেহ। আটহাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলকটাকে যথাস্থানে গেঁড়ে দিল তোরাব।

অদূরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে মৃদুস্বরে পড়লেন পণ্ডিত। শনু পণ্ডিতের ইস্কুল। পড়েই বার্ধক্য-জর্জরিত মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তাঁর। বিড়বিড় করে বললেন, ইতা কিতা কইরাছ আলীর পো। ইতা কিতা কইরাছ?

ঠিক কইরছে। একদম ঠিক। ফোকলা দাঁত বের করে মৃদু হাসল বুড়ো হাশমত। লজ্জায় তখন মাথাটা নুয়ে এসেছে শনু পণ্ডিতের।

লেখক-পরিচিতি

জহির রায়হান ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ছোটোগল্প ও উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। 'হাজার বছর ধরে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'সূর্য গ্রহণ'। চলচ্চিত্রকার হিসেবেও জহির রায়হান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'জীবন থেকে নেয়া', 'কাচের দেয়াল' তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। এছাড়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র 'Stop Genocide' ও 'Birth of a Nation' তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বড়ো ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে জহির রায়হান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিখোঁজ হন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি পাকিস্তানি শাসনামলের পটভূমিতে রচিত। গল্পে দেখা যায়, এনট্রান্স পাশ শনু পণ্ডিত গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য জমিদারের সহায়তায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঝড়ে জরাজীর্ণ স্কুলটি ভেঙে গেলে শনু পণ্ডিতসহ গ্রামবাসী সংকটে পড়েন। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তি জুলু চৌধুরী কোনো সাহায্য করতে রাজি হন না। আশেপাশের গ্রামেও আর স্কুল নেই। এ অবস্থায় সবাই সিদ্ধান্ত নেন একসঙ্গে পরিশ্রম করে নিজেদের স্কুল নিজেরাই পুনর্নির্মাণ করবেন এবং সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁরা স্কুল ঘর তৈরি করতে সক্ষম হন। আবার তাঁদেরই উৎসাহে চাষি তোরাব আলী স্কুলের নাম ফলকে আগের নামের পরিবর্তে লেখেন 'শনু পণ্ডিতের ইস্কুল'।

সবাই মিলে মানুষের জন্য ভালো কাজ করতে চাইলে যে কোনো বাধা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব। আর সে কাজের সফলতায় বাড়ে মনের উদারতাও। গল্পটি সে ইঙ্গিত দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা

পত্তন — আরম্ভ, সূচনা।
গাঁয়ে — গ্রামে।
ন্যুব্জ — কুঁজো।
রুক্ষ — খসখসে।
বার্ধক্য — বৃদ্ধ অবস্থা ।
জ্যামিতিক — জ্যামিতির নকশা জাতীয়।
ফান্ড — তহবিল। ইংরেজি Fund.
হেঁট — মাথা নিচু করা।
এনট্রান্স — প্রবেশিকা পরীক্ষা। এই সময়ের এসএসসি সমমানের।
তদারক — দেখাশোনা।
গণ্ডমূর্খ — জ্ঞানবুদ্ধিহীন।
অনাবাদি — চাষ বা আবাদ করা হয় না এমন।

ছুতোর — কাঠের কাজ করা শ্রমিক।
ধেনো জমি — যে জমিতে ধান হয়।
পেরেক আঁটা — লোহার ছোটো কাঁটা লাগানো।
জ্বলজ্বল — উজ্জ্বল হয়ে থাকা।
আকস্মিক — হঠাৎ।
জং — মরিচা
আঁতকে — চমকে।
স্টাব্লিশমেন্ট — প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি Establishment.
রেগুলার — নিয়মিত। ইংরেজি Regular.
হাঁসফাঁস — অতিকষ্টে শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করা।
অগত্যা — নিরুপায় হয়ে।
খুঁট — কোনা, প্রান্তে।
কাচারি — সরকারি অফিস।
গুঞ্জরন — গুনগুন রব।
মোক্ষম — জুতসই।
ছন — শন। এক ধরনের ঘাস, যা দিয়ে গ্রামে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়।
জোগাড়যন্ত্র — আয়োজন বা প্রস্তুতি।
তড়বড় — তাড়াহুড়া।
ফুর্তিছে — আনন্দের সঙ্গে।
সিন্নি — শিরনি। এক ধরনের খাবার।
বান — বেঁধে দেওয়া।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. শনু পণ্ডিত অগত্যা গাঁয়ে ফিরে এলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
খ. 'জুলু চৌধুরীর স্কুল' কীভাবে 'শনু পন্ডিতের ইস্কুল' এ পরিবর্তন হলো? বুঝিয়ে লেখো।
২। ক. 'কথাটা যেন এক মুহূর্তে নাড়া দিল সবাইকে।' কোন কথা এবং কেন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
খ. কাজের সফলতায় বাড়ে মনের উদারতাও- মন্তব্যটি 'নয়া পত্তন' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি

হাসান আজিজুল হক

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের গাঁয়ে দুজন ডাক্তার ছিলেন। একজন হোমিওপ্যাথ আর একজন এ্যালোপ্যাথ। গাঁয়ের লোক ঠিক ঠিক বলতে পারত না—একজনকে বলত হেমাপ্যাথি আর একজনকে বলত এ্যালাপ্যাথি। দুজনের চিকিৎসার ধরন ছিল বাঁধা। ওষুধও দিতেন একরকম।

২০২৩

হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তারের কাছে গেলেই একটুখানি সাদা ময়দার মতো গুঁড়োতে দু-তিন ফোঁটা স্পিরিট টপ টপ করে ফেলে তিন-চারটি পুরিয়া করে দিতেন। খেতে ভালোও লাগত না, মন্দও লাগত না। কখনো কখনো আবার স্রেফ টিউবওয়েলের পানিতে দু-তিন ফোঁটা স্পিরিট মিশিয়ে দিয়ে বলতেন, 'যা, খাগে যা।'

ওষুধ হাতে নিয়ে,আমি হয়তো ফস করে জিজ্ঞেস করে বসতাম,'ডাক্তারবাবু ভালো হবে তো?' অঘোর ডাক্তার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠতেন, 'ভালো হবে না মানে? ভালো হয়ে উপচে পড়বে। যা, ওষুধ খাগে।'
আমি বলতাম, 'পেটের ভেতর গরগর করে।'
'ও কিছু না, ব্যাঙ হয়েছে তোর পেটে।'

'ওরে বাবা, ব্যাঙ হয়েছে আমার পেটে! গোঁ গোঁ শব্দ হয় যে ডাক্তারবাবু।'
'ও কিছু না-ব্যাঙ ডাকে গোঁ গোঁ করে। আমার ওষুধ যেই এক পুরিয়া খাবি, দেখবি তখন ব্যাঙের লাফানি।'
'কী করে দেখব? ব্যাঙ যে পেটের ভেতরে।'

অঘোর ডাক্তার তখন বলতেন, 'ওরে বাবা, দেখবি মানে বুঝবি। বুঝবি ঠেলা।'
এই হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের এক নম্বর ডাক্তার অঘোরবাবুর কথা।

এইবার দুই নম্বর তোরাপ ডাক্তারের কথা বলি। আগেই বলেছি, ইনি ছিলেন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। কী করে যে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন, কেউ জানে না। শোনা যায়, বাল্যকালে তিনি নাকি এক বড়ো ডাক্তারের হুঁকো সাফ করতেন। সে যাই হোক, তোরাপ ডাক্তারের একটা ছোট্ট শেয়াল-রঙের বেতো ঘোড়া ছিল। তার সামনের পা-দুটি ছাঁদনা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত প্রায় সময়। এই বাঁধা পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গাঁয়ের আশেপাশে চরে বেড়াত ঘোড়াটা। কারো ক্ষতি করতে দেখিনি কোনো দিন।

তোরাপ ডাক্তার খালি ডাক্তারিই করতেন না কিন্তু। নিজের হাতে হালচাষ করতেন। বর্ষা আর শীতের সময় ডাক্তারির ধার ধারতেন না তিনি। বর্ষাটা হচ্ছে চাষবাসের সময় আর শীতকালটা হচ্ছে ফসল কাটার মরশুম। এই সময় রোগী মরে গেলেও তোরাপ ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না।
বর্ষা আর শীতে গাঁয়ের লোকদের রোগী হয়ে শুয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। এই দুই সময়ে কাজ করতে না-পারলে পেটে ভাত জুটবে না। কাজেই রোগটোগ সব শিকেয় তুলে রেখে দিতে হতো তাদের বাধ্য হয়ে। তারপর শরৎকাল এলে তোরাপ ডাক্তারের মোটামুটি অবসর হতো আর গাঁয়ের লোকদেরও রোগী হয়ে শুয়ে থাকার একটু-আধটু মওকা মিলত।

এই সময়ের জন্যেই যেন ওঁৎ পেতে থাকত ম্যালেরিয়া জ্বর। বাঘ যেমন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে ম্যালেরিয়া জ্বর এসে গাঁয়ের গরিব লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এটা ঘটত আশ্বিন মাস থেকে। ম্যালেরিয়ার মতো বাঘা জ্বর তখন আর কিছু ছিল না। ঘরে ঘরে মানুষ ছেঁড়া কাঁথা, ন্যাকড়া, ত্যানা গায়ে চাপিয়ে কোঁকাত। আর সে কী কাঁপুনি! কাঁপুনি থামাবার জন্যে পাথরের জাঁতা পর্যন্ত গায়ে চাপাতে দেখেছি।

এই সময়টায় ছিল তোরাপ ডাক্তারের মজা। ঘরে ঘরে লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে ধুঁকছে। চিকিৎসার জন্যে তোরাপ ডাক্তার ছাড়া গতি নেই। ম্যালেরিয়া পুরোনো হয়ে গেলে কিছুতেই সারতে চায় না। পেটের মধ্যে পিলে উঁচু হয়ে ওঠে, হাত-পা হয়ে যায় প্যাঁকাটির মতো সরু। তোরাপ ডাক্তারের এইরকম অনেক পিলে-ওঠা পুরোনো ম্যালেরিয়া-রোগী ছিল।

রোগের আর একটা সময় ছিল চোত-বোশেখ মাস। এই সময়টায় কলেরা আর বসন্ত হয়ে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত। ম্যালেরিয়া আর কলেরার সব রোগী তোরাপ ডাক্তারের। এখানে অঘোর ডাক্তারের কোনো ভাগ ছিল না। জ্বর হলে, সর্দি হলে, বেশি খেয়ে বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেট ছেড়ে দিলে লোক অঘোর ডাক্তারের কাছে যেত। আনা দুই পয়সা দিলেই, তিনি দিয়ে দিতেন দুই-তিন পুরিয়া ওষুধ। পয়সা দিতে না-পারলে ধারেও দিতেন। এমনকি একটা লাউ বা দুটো শশা নিয়ে গেলেও তিনি রোগী ফেরাতেন না।

অঘোর ডাক্তারের চাষবাসও ছিল না, ভিনগাঁয়ে 'কলে' যাবার ঘোড়াও ছিল না। হোমিওপ্যাথি ওষুধ রাখার জন্য একটা কাঠের বাক্স ছাড়া চিকিৎসার সরঞ্জাম বলতে আর কিছুই ছিল না তাঁর। তবে ওরকম বাক্যবাগীশ লোক লাখে একটা মিলবে কিনা সন্দেহ।

তিনি বলতেন, 'বলি, মরতে তোরা আমার কাছে আসিস কেন বল দিকিনি। তোরাপের কাছে যা না। তা তো যাবি না—গেলে যে ব্যাটা কসাই ঘাড়টি মটকে তাজা রক্ত খাবে তোদের। বলি, এ কী ডাক্তারি বল দিকিন তোরা? তুই বললি, আমার অসুখ করেছে, আর অমনি তোরাপ হয় ছুরি বার করবে, না-হয় কোদাল বার করবে, না-হয় কুড়াল বার করবে...'

একজন রোগী হয়তো বাধা দিয়ে বলল,'না না ডাক্তারবাবু, তোরাপ ডাক্তার আবার কোদাল কুডুল কবে বার করলে!'

'ওই হলো, লাঙলের ফালের মতো ছুঁচওয়ালা একটা বোতল বার করল। কী? না ইঞ্জেকশন দেব, গলা কাটব, মারব, ধরব। তারপর ওষুধ চাও, দেবে তোমাকে এক বোতল পিশাচের রক্ত। ওয়াক থু। যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি বিচ্ছিরি সোয়াদ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! আর আমাদের হোমিওপ্যাথ কী করছে? বাঘ যেমন ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে একটি পুরিয়ার আমার এই ওষুধ তোমার পায়ের আঙুলের ডগা থেকে জীবাণু বাবাজিদের খেদাতে খেদাতে মাথার চুলের ডগা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। অথচ তুমি জানতেও পারছ না।'

সে বছর শরৎকালে ধান কেবল ডাঁশিয়ে উঠছে, ধানের ভেতর সাদা দুধ জমে চাল বাঁধছে, বেশ ঝরঝরে আবহাওয়া, আকাশভর্তি রোদ, একটু একটু ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে—এমনি সময়ে হুড়মুড়িয়ে চলে এল ম্যালেরিয়া জ্বর।

ব্যস, ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক দমাদম বিছানা নিতে লাগল। ছেলে-বুড়ো কেউই বাদ যায় না। ম্যালেরিয়া যাদের পুরোনো হয়ে গেছে তাদের তো খুব মজা। ঠিক বেলা দশটার সময় চোখে সূর্যটা একটু হলুদ হলুদ ঠেকে, তারপর গা একটু গরম হয়, চোখ দুটি সামান্য জ্বালা করে তবে তারপর হুড় হুড় করে এসে পড়ে জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে কী পিপাসা! ঘটি ঘটি পানি খেয়ে পিপাসা কমে না। পানি পেটে গিয়ে গরম হয়ে যায়, তারপর গা-টা গুলিয়ে ওঠে, তারপরেই বমি। বমি হয়ে গেলেই আবার পিপাসা। আবার ঘটি ঘটি পানি খাওয়া তারপর আবার বমি। জ্বর কমে আসে আস্তে আস্তে। রাত দশটার দিকে একদম জ্বর চলে গিয়ে গা ঠান্ডা।

গাঁয়ের অর্ধেকের বেশি লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ল। তোরাপ ডাক্তার হলুদ রঙের বড়ো বড়ো বিকট দাঁত বের করে এ্যাই বড়ো সিরিঞ্জ নিয়ে, রোগীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। দুই পকেট ভর্তি ম্যাপাক্রিন বড়ি। সে যে কি ভয়ানক বড়ি ভাবা যায় না। রোগী যেখানেই থাক, সে মাটির দাওয়াতেই হোক আর খোলা আকাশের নিচে উঠোনেই হোক বা ঘরের ভেতরেই হোক, গলায় স্টেথোটি ঝুলিয়ে ইনজেকশনের বাক্সটি হাতে নিয়ে তোরাপ ডাক্তার ঠিক হাজির। লোকেই-বা আর কী করে? কাজেই বাধ্য হয়ে তোরাপ ডাক্তারকে ডাকতেই হয়। বেচারা অঘোর ডাক্তারের গুঁড়োতে যে কোনো কাজই হয় না।

সে যাই হোক, ঘরে ঘরে ঢুকেই গোদা গোদা এ্যাকাব্যাঁকা আঙুল দিয়ে তোরাপ ডাক্তার রোগীর কব্জি চেপে ধরে কিছুক্ষণ নাড়ি পরীক্ষা করতেন।

রোগীরা সব বলাই সাধু। হয়তো জিজ্ঞেস করল, "তবে কি 'ম্যালোরি' জ্বর ডাক্তার সাহেব?"
তোরাপ ডাক্তার দাঁত কড়মড়িয়ে বলতেন, 'তাছাড়া আর কী হবে? এই যে দেখাচ্ছি মজা, একটি ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার ভূত ছাড়াব। এই বলে আশেপাশের লোকদের আদেশ দিতেন, 'ধর তো এটাকে চেপে, সুঁইটা দিয়ে দিই একবার। আর দুটো টাকা রাখো এখানে আমার সামনে, আমার ফি আর ওষুধের দাম। উঁহু আগে টাকা রাখো, তারপর অন্য কাজ।'

এই বলে তোরাপ ডাক্তার একদিকের পকেটে টাকা দুটো ভরতেন, আরেক পকেট থেকে বের করতেন ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ। কী প্রচণ্ড সিরিঞ্জ! আর তার ছুঁচ তো নয়, ঠিক যেন মোষের লাঙলের ফলা। লোকের গায়ে ফুঁড়তে ফুঁড়তে ছুঁচের মাথা গিয়েছে ভোঁতা হয়ে। সেই ভয়ানক যন্ত্র দেখেই তো রোগী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করত। তোরাপ ডাক্তার চিৎকার করতেন, 'ধর ধর, ঠেসে, চেপে ধর'-সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন ষণ্ডাগোছের লোক গিয়ে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরত রোগীকে। তারপর কোমরের কাপড়ের কষিটা খুলে তোরাপ ডাক্তার মাংসের মধ্যে প্যাঁট করে ঢুকিয়ে দিতেন সেই মোটা ছুঁচ। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সমস্ত পা-টা যেত অবশ হয়ে।

এইরকম করে ইনজেকশন দিয়ে সে-বছর শরৎকালে তোরাপ ডাক্তার দুহাতে টাকা রোজগার করতে লাগলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যত বাড়ে ততই বাড়ে তাঁর রোজগার। ইনজেকশন দিয়ে তিনি দু-তিনটে লোককে তো চিরদিনের জন্য খোঁড়া করে দিলেন। তাঁর ম্যাপাক্রিন বড়ি খেয়ে কয়েকজন তো চিরকালের জন্য কালা হয়ে গেল। তবু লোকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাছেই যেতে লাগল। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ম্যালেরিয়ার মতো দুর্দান্ত জ্বর ঠেকানের সাধ্য ছিল না অঘোর ডাক্তারের। তাঁর কাছে আর কেউ যায় না। তাঁর সংসার চলাই দায় হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত কী আর করেন তিনি!

একদিন অঘোর ডাক্তার চুপিচুপি জেলা শহরে গিয়ে একটা সিরিঞ্জ আর কিছু কুইনাইন ইনজেকশন কিনে আনলেন। মনে মনে বললেন, তোরাপটার বড্ড বাড় বেড়েছে। খুব দু-পয়সা করে নিচ্ছিস, না? কিন্তু আমি হচ্ছি সব্যসাচী, সে খবরটা তো জানিস না তোরাপ। আমি দুই হাতে তির ছুড়তে পারি। ইচ্ছে হলে হোমোপ্যাথি করব আবার ইচ্ছে হলে এ্যালাপ্যাথি ইনজেকশন দেবো। মনে মনে এইসব কথা ভেবে তিনি সিরিঞ্জের ছুঁচ কিনলেন খুব মিহি দেখে। কাউকে কোনো কথা না-বলে সরঞ্জাম সব কিনে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এলেন সন্ধেবেলা।

পরের দিন সকাল বেলায় মুখটি ধুয়ে দাওয়ায় কাঠের টুল পেতে কেবল বসেছেন তিনি—এমন সময় ইদরিস আলীর বাড়ি থেকে লোক এল। ইদরিস আর তার পুরো পরিবার অনেকদিন থেকে তাঁর রোগী। শত অসুখ-বিসুখে তারা কোনোদিন তোরাপ ডাক্তারের কাছে যায় না, বলে, হেমাপ্যাথির ওপর ওষুধ আছে নাকি ডাক্তারবাবু? মরলে আপনার হেমাপ্যাথি খেয়েই মরব, তবু তোরাপ ডাক্তারের হাতে জান দিতে পারব না।

ইদরিস আলীর বাড়ির লোকের কাছ থেকে অঘোর ডাক্তার শুনলেন যে গত পাঁচ-সাত দিন থেকে ইদরিস নিদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ। কিন্তু তোরাপ ডাক্তারের নাম করলেই তার হুঁশ ফিরে আসছে আর তখন সে বলছে, 'আমি অঘোর ডাক্তারের হেমাপ্যাথি খেয়ে মরব, কিছুতেই এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছে করাব না।'

কথা শুনে অঘোর ডাক্তার মিটিমিট হেসে বললেন, 'কেন রে, এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছেটা খারাপ হলো কোথায়? তোরাপ হলো ডাকাত, ও আবার ডাক্তার হলো কবে? এখন থেকে আমিই এক-আধটু এ্যালাপ্যাথি করব ভাবছি।' ইদরিসের বাড়ির লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি এ্যালাপ্যাথি করবে কী গো? তুমি আবার সুঁই দেবে নাকি? অঘোর ডাক্তার রেগে বললেন, 'কেন, দেব না কেন? সব বিদ্যাই জানা আছে আমার বুঝলি? চিকিচ্ছেটা তোরাপের লাঙল চালানো নয়। কেমন মিহি সুঁই কিনেছি দেখবি। ইদরিসকে আজ ফুঁড়ব। তুই যা, আমি আসছি। আর শোন বাবা, দুটো টাকা আগে জোগাড় করে রাখিস। তোরাপও দু-টাকা করে নেয়, আমাকে দিবি না কেন?' অঘোর ডাক্তার কুইনাইন ইনজেকশন দিবেন এই খবর দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে গেল। গাঁয়ের যত সুস্থ মানুষ ছিল, সব ছুটল ইদরিসের বাড়ির দিকে। ইদরিসের মেটেবাড়ির ছোট্ট ঘরে আর তিলধারণের জায়গা নেই—একটা লোক কোমরে চাদর জড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচাতে লাগল, 'এই, এই সব বাতাস ছেড়ে দাও, বাতাস আসতে দাও।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! অঘোর ডাক্তার হেমাপ্যাথি ছেড়ে ইনজেকশন দেবে—এ কী সোজা কথা!

রোগা অঘোর ডাক্তার বহু কষ্টে ঘরে ঢুকে, ট্যাঁক থেকে সিরিঞ্জ, ওষুধ এইসব বের করলেন। লোকজনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুই হাঁটু থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখে অবশ্য তম্বি করলেন, 'ভিড় কমাও, আলো আসতে দাও তোমরা।'

এই কথা বলে বহু কষ্টে সিরিঞ্জের মাথায় সুচ লাগালেন, তারপর ওষুধ ভরে রোগীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় জ্বরের ঘোর ভেঙে জবাফুলের মতো গোল দুটো চোখ মেলে ইদরিস বলল, 'ডাক্তারবাবু শেষে আপনার এই কাজ!' এই বলে ইদরিস চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রইল। অঘোর ডাক্তার বললেন, 'ধর বাবা তোরা, ইদরিসকে একটু ধর।' চোখ না-খুলেই ইদরিস বলল, 'কাউকে ধরতে হবে না ডাক্তারবাবু, আপনি ইনজিশন দ্যান—বরঞ্চ আপনাকে ধরতে হলে ওদেরকে বলুন।'

হঠাৎ কেমন বোকার মতো অঘোর ডাক্তার হাসলেন, তারপর ইদরিসের কোমরের নিচে মাংসে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'হেঁ হেঁ বড়ো মিহি কিনেছি ছুঁচটা, এই তুললাম', এই কথা বলে সকলের দিকে চেয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় আবার বললেন, 'হেঁ হেঁ তোরাপের কম্ম নয়, তোমরা দ্যাখো একবার, এই তুললাম সিরিঞ্জ,

এইবার, এইবার'—বলেই প্যাঁট করে সিরিঞ্জের সুচ ঢুকিয়ে দিলেন ইদরিসের কোমরের মাংসে। হাত কাঁপতে লাগল তাঁর, বারবার বলতে লাগলেন, 'গভীর করে ফুঁড়তে হবে, গভীর করে ফুঁড়তে, ... এই যাহ্।' পট করে একটা আওয়াজ উঠল আর হাহাকার করে উঠলেন অঘোর ডাক্তার, 'হায় হায়, ছুঁচ ভেঙে গেছে, ছুঁচ ভেঙে গেছে, গেল গেল, সর্বোনাশ হলো, হায় হায়...।'

সুচটা তখন মাংসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অঘোর ডাক্তারের শীর্ণ দুই হাত আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটাকে। তখন কোথা থেকে একটা জোয়ান ছেলে ছুটে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে ফেলল সুচটা ইদরিসের কোমর থেকে। সবাই চুপ করে আছে—ছেলেটা দাঁত থেকে খুলে হাতে নিল সুচটা, অঘোর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, 'এই যে ডাক্তারবাবু পেয়েছি।' অঘোর ডাক্তার দেখতে পেলেন না। ক্ষোভে দুঃখে তখন তাঁর চোখে অশ্রুর ঢল নেমেছে।

লেখক-পরিচিতি

হাসান আজিজুল হকের জন্ম ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিশু-কিশোর রচনাসহ তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই ডজনেরও অধিক। হাসান আজিজুল হকের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ও 'জীবন ঘষে আগুন', উপন্যাস 'আগুনপাখি' ও 'সাবিত্রী উপাখ্যান' এবং শিশুতোষ-গ্রন্থ 'লালঘোড়া আমি' ও 'ফুটবল থেকে সাবধান' প্রভৃতি। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমিসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন একুশে ও স্বাধীনতা পদক।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এ গল্পে লেখক সরস ভাষায় গ্রাম্য দুজন হাতুড়ে ডাক্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেছেন। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের নাম ছিল অঘোর এবং এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের নাম ছিল তোরাপ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলে কাতর হলে তোরাপের আয় রোজগারের সুবিধা হতো; আর অঘোর ডাক্তারের কাছে কেউ যেতই না। রোগীর অভাবে অঘোর ডাক্তারের সংসার চলাই দায় হয়ে উঠল। তাই অঘোর ডাক্তার একদিন গোপনে বাজার থেকে সিরিঞ্জ আর কুইনাইন ইনজেকশন কিনে এনে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শুরুর চেষ্টা করলেন। অঘোর ডাক্তার কাঁপা কাঁপা হাতে ইদরিস নামের এক রোগীর কোমরের গভীর মাংসে সিরিঞ্জের সুচ ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে সুচটা ভেঙে ফেললেন। ওই সময়ে একটি বুদ্ধিমান ছেলে বিষয়টার ভয়াবহ পরিণতি আঁচ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে সুচটা বের করে নেয়। লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান ও অভিমানে অঘোর ডাক্তারের চোখে অশ্রু ঝরে। তিনি নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন।

যার যেটা কাজ সেটাই করা উচিত, নয়তো দুঃখ ও অপমান বয়ে বেড়াতে হয়; গল্পটিতে এ ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

২০২৫

শব্দার্থ ও টীকা

হোমিওপ্যাথ — রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুর ছোটো অংশ দিয়ে ওই রোগ নিরাময়ের চিকিৎসাপ্রণালি। ইংরেজি Homoeopath.

এ্যালোপ্যাথ — ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালি বিশেষ। ইংরেজি Allopath.

স্পিরিট — একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। ইংরেজি Spirit.

স্রেফ — শুধু।

বেতো — বেতের মতো।

ছাঁদনা — এক ধরনের দড়ি। গরু বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।

শিকেয় তোলা — শিকা হলো দড়ি দ্বারা নির্মিত থলের মতো বস্তু, যেখানে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাঁড়ি-পাতিল ঝুলিয়ে রাখা হয়। এখানে 'শিকেয় তোলা' বাগ্‌ধারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ স্থগিত বা মুলতবি রাখা।

মওকা — সুযোগ।

ওঁৎ — পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করা।

টুঁটি — গলা বা কণ্ঠনালি।

জাঁতা — শস্য গুঁড়া করার ভারি যন্ত্র।

পিলে — প্লিহা। পাকস্থলির বামপাশে অবস্থিত মানবদেহের একটি অঙ্গ।

প্যাঁকাটি — পাটকাঠি। ছাল ছাড়ানো শুকনো পাটগাছ।

পুরিয়া — মোড়ক। হোমিওপ্যাথি ওষুধ পরিবেশনের জন্যে ব্যবহৃত প্যাকেট।

কল — ডাক, আহ্বান। এককালে ডাক্তারকে টাকা দিয়ে বাড়িতে ডেকে আনাকে 'কল' বলা হতো। ইংরেজি call.

বাক্যবাগীশ — বাক্‌পটু।

ডাঁশিয়ে — প্রায় পাকা।

ম্যাপাক্রিন — একধরনের ঔষধ। ইংরেজি mapacrine.

স্টেথো — স্টেথোস্কোপ, হৃৎস্পন্দন মাপার যন্ত্র। ইংরেজি Stetho.

সিরিঞ্জ — ইনজেকশন দেওয়ার উপযোগী সুচ। ইংরেজি Syringe.

বলাই সাধু — শ্রীকৃষ্ণের বড়ো ভাই বলরাম। এখানে ভালো মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুণ্ডপাত — শিরশ্ছেদ। এখানে ‘অভিশাপ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুইনাইন — ম্যালেরিয়া-জ্বরের ঔষধবিশেষ। ইংরেজি Quinine.

সব্যসাচী — দুই হাতে সমান পারদর্শী। এখানে ‘দক্ষ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ট্যাঁক — কোমর। লুঙ্গি কোমরে বাঁধার সময় যে থলে আকৃতি অংশে টাকা-কড়ি রাখা হয়।

তম্বি — বকাঝকা করা।

আঁতিপাঁতি — পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

ইনজিশন — ‘ইনজেকশন’-এর আঞ্চলিক রূপ। ইংরেজি Injection.

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. অঘোর ডাক্তারের চিকিৎসার ধরন কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো।

খ. যার যে কাজ সেটাই করা উচিত– তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? ‘হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি’ গল্পের আলোকে যুক্তি দাও।

২। ক. ‘এ্যালাপ্যাথি চিকিচ্ছেটা খারাপ হলো কোথায়?’- কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন?

খ. তোরাপ ডাক্তারের চিকিৎসার সময়কাল ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মন্তব্যটি ‘হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেন্স

রূপান্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের ছয় মাস আগে আমার বাবার চোখ থেকে এই পৃথিবীর আলো চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল, তিনিও আমাকে দেখেননি।

আমি থাকতাম আমার মায়ের সঙ্গে। মা হালকা গড়নের মহিলা, আমার এক দাদি তাঁকে বলতেন মোমের পুতুল। মার স্বভাবটিও কোমল প্রকৃতির, তিনি কখনো রাগ করতে পারতেন না। আমাদের বাড়িতে কাজ করত পেগোটি বলে একটি মেয়ে, ওর সঙ্গেও মাকে কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। পেগোটি থাকত আমাদের পরিবারের একজন হয়ে, আমাদের খেলাধুলা সব একসঙ্গে, খাওয়াদাওয়াও একসঙ্গে, একই টেবিলে। পড়াশোনা আমি করতাম মায়ের কাছেই, মায়ের কাছে লেখাপড়ার ব্যাপারটা খেলাধুলার মতোই ভালো লাগত। মা আর পেগোটির সঙ্গে আমার বেশ ভালোই কাটছিল।

আমার এই ছিমছাম সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে আমার আট বছর বয়সে। মা একদিন ফের বিয়ে করলেন। আমার সৎ বাবা মার্ডস্টোন সাহেব দশাসই পুরুষ, তাঁর মস্ত জুলফি, পুরু গোঁফ এবং জোড়া ভুরু। তাঁকে দেখে প্রথম থেকেই আমার ঠিক নিজের লোক বলে মনে হয়নি। এর ওপর আমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন তাঁর বোন। ভাইবোনের চেহারায় খুব মিল, গলার স্বরও প্রায় একই রকম। ভাইবোনের স্বভাবও

একইরকম– যেমন মার্ডস্টোন সাহেব তেমনি তাঁর বোন–দুজনেই কড়া মেজাজের মানুষ, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমি তাঁরা বরদাশত করতে পারতেন না, আসার পর থেকেই আমার কথাবার্তায়, আদব-কায়দায় খুঁত বার করার জন্য একেবারে হন্যে হয়ে উঠলেন।

এমনকি আমার লেখাপড়া শেখাবার কাজটিও মার্ডস্টোন সায়েব নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমি কিন্তু কোনো ব্যাপারেই তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইতাম না, পড়াশোনা করে পড়া দিতে যেতাম মাকেই। কোথাও আটকে গেলে মা আদর করে বলতেন, 'বাবা ডেভি, মনে করতে পারছ না? একটুখানি চেষ্টা করে দেখো তো।'

মার্ডস্টোন সাহেব কর্কশ গলায় বলতেন, 'আহ্। ক্লারা, ওভাবে বললে হবে না।'
মার্ডস্টোন সাহেবের বোনও একই রকম কণ্ঠে ভাইয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসতেন, 'সোজা বলে দাও, পড়া মুখস্থ করে আসুক।'

এখন তাদের মুখের ওপর কিছু বলা আমার মায়ের সাধ্যে কুলায় না। আমি আবার বই নিয়ে বসি। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, মায়ের কোল ঘেঁষে বসে যে কাজটি আমি পানির মতো সহজ করে বুঝতে পারি, যে পড়া অবলীলায় বলে যাই, মার্ডস্টোন সাহেব কি তাঁর বোন সামনে থাকলে সেটি আর হয়ে ওঠে না। মার্ডস্টোন সাহেব জিজ্ঞেস করলে আমার জানা অঙ্ক ভুল হয়, মুখস্থ পড়া ভুলে যাই।

ঠিকমতো পড়া দিতে পারলেও তাঁদের মন পাওয়া যায় না, মার্ডস্টোন সাহেব এমন সব কঠিন অঙ্ক কষতে দিতেন যে আমার একেবারে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হতো। তাঁদের এড়িয়ে চলার জন্য আমি গিয়ে ঢুকতাম আমার ঘরের লাগোয়া ছোটো ঘরে, এখানে আমার বাবার কয়েকটি বই স্তূপ করে রাখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এসব কেউ ছুঁয়েও দেখত না। এখানে একা একা বসে আমি 'রডারিক র‍্যানডম', 'টম জোনস', 'দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড', 'ডন কুইকসোট', 'রবিনসন ক্রুসো', 'আরব্য রজনী'–এসব বইপত্র পড়তাম। কিন্তু মার্ডস্টোন সাহেবের হাত থেকে তবু আমার রেহাই নেই। আর আমার এমন অবস্থা যে তাঁর হাতে পড়লেই পড়া আর বলতে পারি না।

একদিন এমনি কী ভুল হয়ে গেল, মার্ডস্টোন সাহেব আমার ঘরে ঢুকলেন হাতে বেত নাচাতে নাচাতে। পেছনে তাঁর বোন। প্রায় ফৌজি কায়দায় দুজনকে ঢুকতে দেখে মা ভয়ে কাঁপছিলেন। আমার ওপর হঠাৎ করে বেতের বাড়ি পড়তে শুরু করলে আমি চিৎকার করে বললাম, 'পায়ে পড়ি, মারবেন না, মারবেন না। আমি তো আজ সারাদিন ধরে পড়লাম, আপনাদের দুজনকে দেখেই সব ভুলে গিয়েছি, আপনাদের দেখলেই আমার জানা পড়া গুলিয়ে ফেলি।'

'তাই?' বাজখাঁই গলায় মার্ডস্টোন সাহেব বললেন, 'সব গুলিয়ে ফেলো, না? দেখি কি করে মনে রাখতে পারো, সেই ব্যবস্থা করি।'

আমার মাথাটা তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি মাথা গলিয়ে তাঁর হাত থেকে মুক্ত হলে তিনি আমার মুখ চেপে ধরে পিঠে সপাং সপাং করে বেতের কয়েকটা ঘা মারলেন, আমি আর সহ্য করতে না পেরে আমার মুখে চেপে ধরা তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলে এ্যায়সা জোরে এক কামড় বসিয়ে দিলাম যে যন্ত্রণায় তিনি একেবারে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর আসল মার, বেতের মুহুর্মুহু আঘাতে আমার শরীর একেবারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম আজ আমি একেবারে মরেই যাব। মারতে মারতে মার্ডস্টোন সাহেবও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ঘরে আমাকে ঠেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হলো। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, কিন্তু ঘরে আমার একটি বাতিও জ্বলল না। এর মধ্যে মিস মার্ডস্টোন রুটি আর কয়েক টুকরো গোশত দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার পর আর কেউ এল না। আমি একা একাই ঘুমিয়ে পড়লাম। এইভাবে পাঁচদিন কাটল, আমার মনে হলো, মার্ডস্টোন সাহেবের হাত কামড়ে দিয়ে আমি বোধহয় ভয়ানক একটি অপরাধ করে ফেলেছি। আমার মা একদিনও এলেন না, তাঁকে পেলেও না হয় আমি মাফ চাইতে পারতাম।

পেগোটি আমাকে চুপচুপ করে খবর দিয়ে যায় যে, লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুলে আমাকে ভর্তি করার আয়োজন চলছে। দেখতে দেখতে আমার বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আমি বিদায় নেওয়ার সময় মার গলা বেশ ভারী হয়ে আসছিল। এতে মার্ডস্টোন সাহেব এবং তাঁর বোন দুজনেই খুব বিরক্ত। আমার জন্যে মা যে একটু প্রাণ খুলে কাঁদবেন এঁরা সে অধিকারটুকুও তাঁকে দিতে রাজি নন।

ঘোড়ার গাড়ি যাত্রা শুরু করল। পকেট থেকে রুমাল বের করে আমি চোখে চেপে ধরলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি তা ভিজে একেবারে চপচপে হয়ে গেছে। আধমাইল পথ পেরিয়ে গাড়িটা একটু থামে, থামতে না থামতে পথের ধারে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে পেগোটি। এক লাফে গাড়িতে উঠে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাড়িতে আমাকে আদর করা দূরে থাক, বেচারি কথা বলার সুযোগটা পর্যন্ত পায় না। আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটি কাগজের টুকরো আমার হাতে তুলে দিয়ে আর একবার সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর গাড়ি থেকে নামবার আগে গাড়িতে একটি ব্যাগ রেখে দিল।

গাড়ি ফের গড়িয়ে চলতে শুরু করলে আমি ব্যাগটা খুলে দেখি এক টুকরো কাগজে আমার মার লেখা, 'ডেভিকে অনেক আদর ও ভালোবাসা।' কাগজটির সঙ্গে কয়েকটি টাকা।

কিছুক্ষণ পর একই এক্কাগাড়ি থেকে নেমে উঠতে হলো লন্ডনগামী কোচে। বিকাল তিনটেয় ঘোড়ায় টানা সেই কোচ ছাড়ল, লন্ডন পৌঁছবার কথা সকাল আটটায়। কোচে রাত্রিটা কিন্তু তেমন আরামে কাটেনি। দুইপাশে দুজন ভদ্রলোক ঘুমোতে শুরু করলেন, আমার দুই ঘাড় হলো তাঁদের দুজনের বালিশ। আমার অবস্থা একেবারে শোচনীয়।

শেষ পর্যন্ত সূর্য উঠল। আমার দুই দিকের দুই সহযাত্রীর ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে লন্ডন শহর দেখে আমার যে শিহরন হলো তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই আমাদের স্বপ্নের লন্ডন শহর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এখানে আমি একেবারে একা। রবিনসন ক্রুসোর চাইতেও একা। রবিনসন ক্রুসো যে একা তা তো আর কেউ দেখেনি, আর এই জনাকীর্ণ শহরে আমার একাকিত্ব যেন সকলের চোখে পড়ছে।

নানারকম ঝামেলার পর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। 'তুমিই তো নতুন এলে?' আমার দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'এসো, আমি সালেম হাউসের শিক্ষক।' আমি জানি যে সালেম হাউসে আমাকে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু ওই স্কুলের এই শিক্ষকের চেহারা একটুও আকর্ষণীয় নয়। দেখতে তিনি বড়ো রোগা, গায়ের রং ফ্যাকাশে, তাঁর পোশাকও বিবর্ণ, প্যান্টের ঝুল ও শার্টের হাতা বেশ খাটো। আমার হাত ধরে তিনি চলতে শুরু করলেন। এদিকে আমার তখন খুব খিদে পেয়েছে, শরীর বেজায় ক্লান্ত। খিদের কথা বলতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছিল, তবে আমার নতুন শিক্ষকের চেহারা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি বললাম, 'কাল দুপুরের পর থেকে কিছু খাইনি।' আরো সাহস করে বললাম, 'কিছু কিনে খেলে ভালো হতো।' তিনি রাজি হলে একটা দোকান থেকে ডিম আর মাংস কিনে নিলাম। এখন এগুলো খাব কী করে? আমার নতুন শিক্ষক একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে কোথায় যে নিয়ে চললেন আমি ঠিক বুঝতেও পারছিলাম না। রাস্তায় সাংঘাতিক কোলাহল, হইচই, এইসব আওয়াজে আমার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল, লন্ডন ব্রিজ পেরোবার সময় ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ চলবার পর শিক্ষক আমাকে নিয়ে নামলেন। তাঁর সঙ্গে আমি যে ছোটো ঘরটিতে ঢুকলাম সেটি বেশ গরিব কোনো মানুষের বাসস্থান, দেখেই বোঝা যায় এটা কোনো অনাথ আশ্রমের অংশ। আবার একটি পাথরে খোদাই করা রয়েছে, 'পঁচিশ জন দরিদ্র রমণীর জন্য প্রতিষ্ঠিত।'

ছোটো স্যাঁতসেতে ঘরটিতে ঢুকতেই বৃদ্ধা এক মহিলা খুশিতে ডেকে উঠলেন, 'বাবা চার্লি।' কিন্তু আমার দিকে তাঁর চোখ পড়তেই একটু থতমত খেয়ে চুপ করলেন। নতুন শিক্ষক তাঁর হাতে ডিম দিলে সসপ্যানে সেটা ভেজে দিলেন, মাংসের টুকরো সেদ্ধ করে দিলেন। আমি তো তখন ক্ষুধার্ত, গোগ্রাসে ওইসব খাচ্ছি তো শুনি যে বৃদ্ধা মহিলা শিক্ষককে বলছেন, 'বাঁশিটা সঙ্গে থাকলে একটু বাজাও না।'

কোটের ভেতর হাত দিয়ে শিক্ষক বাঁশির তিনটে টুকরা বের করলেন, টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বাঁশি ঠিক করে নিয়ে তিনি বাজাতে শুরু করলেন।

তিনি কী সুর বাজালেন আমি জানি না, কেমন বাজিয়েছেন তাও বুঝিনি, কিন্তু তাঁর বাঁশির তীব্র ধ্বনি আমার বুকে দারুণ প্রতিধ্বনি তুলল, আমার সমস্ত বেদনার কথা যেন খুঁড়ে ওপরে উঠে এল, আমার সব কষ্টের কথা মনে পড়ল, শেষপর্যন্ত চোখের পানি আর চেপে রাখতে পারলাম না। এর মধ্যে ওই মহিলা এবং আমার নতুন শিক্ষকের চেহারার মিল দেখে আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম যে এঁরা মা এবং ছেলে। আমার শিক্ষকের মা এত গরিব কেন, দাতব্যভবনে বাস করেন কেন—এসব প্রশ্ন মনে একটু উঁকি দিলেও আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তখন কেবল বাঁশির সুর। আমার আস্তে আস্তে ঘুম পেতে লাগল। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি আমি ঘোড়ার গাড়িতে বসে রয়েছি, পাশে পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে আরেকটি পা রেখে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন আমার নতুন শিক্ষক। আমি ফের ঘুমিয়ে পড়ি।

গাড়ি থামলে স্যার আমাকে নিয়ে নিচে নামলেন। সামনে উঁচু দেওয়ালে মস্ত একটি বাড়ি, সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে লেখা 'সালেম হাউস।' এটাই তাহলে আমার নতুন স্কুল।

দরজায় কড়া নাড়লে শক্তসমর্থ একটি লোক বেরিয়ে আসে। ঘাড়টা ষাঁড়ের ঘাড়ের মতো মোটা, একটা পা কাঠের, ছোটো করে কাটা মাথার চুল। স্যার আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে সে আমাকে ভালো করে দেখল। লোকটি ভেতর থেকে এক জোড়া জুতো এনে সামনে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'মেল সাহেব, মুচি আপনার জুতো ঠিক করতে চায় না। এটার মেরামত করার কিছু নেই, তালি দিতে দিতে একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

জুতোজোড়া হাতে আমার নতুন শিক্ষক মেল সাহেব ওপরে উঠতে লাগলেন, পিছে পিছে আমি। দোতলায় উঠে শেষ প্রান্তের ঘরে হাঁটছি, হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বোর্ডের দিকে, বোর্ডে সুন্দর করে লেখা 'সাবধান এটা কামড়ায়।' আশেপাশে নিশ্চয় কোনো কুকুর আছে এবং সেটা অবশ্যই কামড়ায় এই ভেবে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মেল সাহেব পেছনে তাকিয়ে বললেন, 'কী হলো?'

'এখানে বোধ হয় কুকুর আছে স্যার।' বোর্ডের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কুকুর নয়, কপারফিল্ড। আমাকে বলা হয়েছে, ওই বোর্ডটা যেন তোমার পিঠের সঙ্গে আটকে দিই। এখানে এসে প্রথমেই তোমার মনটা খারাপ করে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু এটা আমাকে করতেই হবে।'

আমার সৎ বাবার হাতের আঙুলে কামড় দিয়েছিলাম, সেই খবর তাহলে এখানেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তার শাস্তি কি আমাকে পেতে হবে এভাবে? সত্যি, আমি একেবারে দমে গেলাম। ক্লাসের সহপাঠীরা আমার পিঠ দেখবে আর আমাকে নিয়ে যে কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে ভাবতেই লজ্জায়, ভয়ে আমি একবোরে কুঁকড়ে যেতে লাগলাম।

স্কুলের মালিক এবং প্রধান ক্রিকল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সুন্দর বৈঠকখানায় বসেছিলেন মিসেস ক্রিকল আর তাঁদের মেয়ে। এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কাঠের পা-ওয়ালা ওই লোকটিকে।

ক্রিকল সাহেবের মুখ টকটকে লাল, মনে হয় সবসময় সেখানে আগুন জ্বলছে, চোখজোড়া তাঁর ছোটো, কপালের রগগুলো সব স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর নামে কোনো রিপোর্ট আছে?'

'না স্যার', কাঠের পা-ওয়ালা জবাব দিল, 'নতুন এসেছে, এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করার সুযোগ পায়নি।'

'এদিকে এসো।' ক্রিকল সাহেব আমাকে এই আদেশ দিলে কাঠের পা-ওয়ালা বলে ওঠে, 'এদিকে এসো।'

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে আমার কান ধরে ক্রিকল সাহেব বললেন, 'তোমার সৎবাবাকে আমি চিনি, শক্ত স্বভাবের মানুষ। তা তিনিও আমাকে ভালো করেই চেনেন। তুমি আমাকে চেনো?'

'না স্যার।'

'চেনো না, না?' আমার কানে একটা মোচড় দিয়ে তিনি বললেন, 'চিনবে হে চিনবে।'

ক্রিকল সাহেবের এই ব্যবহারে আমার যতই খারাপ লাগুক, অনেক বেশি ভয় করতে লাগল স্কুল খুললে ছেলেদের আচরণটা কী হবে সেই ভাবনা করে। তো একদিন স্কুল খুলল, ছেলেরা হোস্টেলে এসে পড়ল। ছেলেরা যথারীতি আমার পেছনে লাগল, কারো পিঠে অমনি একটা বোর্ড সাঁটা থাকলে কিছু ঝক্কি তো তাকে পোয়াতে হবেই। তবে যা ভেবেছিলাম সে রকম ভয়াবহ গোছের কিছু ঘটল না। 'সাবধান, এটা কামড়ায়' বলতে বলতে ছেলেরা আমাকে খ্যাপাত, কেউ কেউ আঁতকে ওঠার ভান করত, আবার বুনো মানুষের মতো নাচতে নাচতে 'কুকুর কুকুর' বলে চিৎকারও করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই তেমন উৎপাত করেনি। এর ওপর ক্রিকল সাহেব ক্লাসে একদিন আমাকে বেদম মারতে গিয়ে দেখলেন যে পিঠে সাঁটা ওই বোর্ডের জন্য বেতের বাড়ি ঠিক জুতমতো লাগানো যাচ্ছে না, তাই তিনি নিজেই ওটা খুলে ফেললেন।

তবে ছেলেদের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে। ওর নাম জে. স্টিরফোর্ড। আমার চেয়ে অনেক বছর বড়ো এই ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর, ছাত্র হিসেবেও মেধাবী বলে তার বেশ নামডাক রয়েছে। তার প্রতি ক্রিকল সাহেবের একটু পক্ষপাতিত্বও লক্ষ করা যায়। তো এই ছেলেটি প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলে। 'রবিনসন ক্রুসো,' 'আরব্য রজনী,' 'ডন কুইকসোট'— এসব বইয়ের গল্প আমি বেশ জমিয়ে বলতে পারতাম বলে ছেলেরা অনেকেই আমার পাশে ভিড় করত। স্টিরফোর্ড আর আমি রাত্রে পাশাপাশি বিছানায় ঘুমাতাম, ঘুমাবার আগে তাকে রোজ ওইসব গল্প বলে শোনাতে হতো। এমনিতে স্টিরফোর্ড আমাকে ভালোবাসত আর স্বয়ং ক্রিকল সাহেব তাকে সমীহ করতেন বলে কোনো ছেলে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পেত না। কিন্তু স্টিরফোর্ড কখনো কখনো বড্ডো নিষ্ঠুর হয়ে উঠত।

একদিন বিকালবেলার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মেল সাহেবের ক্লাসে গোলমাল হচ্ছিল। মেল সাহেব এমনিতে নিরীহ গোছের মানুষ, সহজে বড়োগলা করে কথা বলতে পারতেন না। সেদিন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছিলাম। ছেলেরা প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেই চলেছে, ক্লাসে যে একজন শিক্ষক আছেন তা বোঝাই যাচ্ছিল না। মেল সাহেবের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি হঠাৎ করে চিৎকার করে ধমক দিলেন, 'চুপ। চুপ কর।' তাঁর মুখে এরকম ধমক শুনতে অনভ্যস্ত ছেলেরা অবাক হয়ে চুপ করে গেল। শেষ সারিতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শিস দিচ্ছিল স্টিরফোর্ড, সে কিন্তু থামল না, শিস দিয়েই চলল। মেল সাহেব বললেন, 'স্টিরফোর্ড, চুপ কর।'

'আপনিই চুপ করুন।' স্টিরফোর্ড পালটা ধমকের সুরে বলল, 'জানেন আপনি চোখ রাঙিয়ে কথা বলছেন কার সঙ্গে?'

'স্টিরফোর্ড, তুমি কি ভেবেছ তোমার বেয়াদবি আমি লক্ষ করিনি? ছোটো ছোটো ছেলেদের তুমি বারবার উসকে দিচ্ছ, আমি কি দেখছি না ভেবেছ?' বলতে বলতে মেল সাহেবের ঠোঁটজোড়া কাঁপছিল, 'সবাই জানে যে এখানে তোমার দিকে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সেই সুযোগ নিয়ে তুমি একজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করতে সাহস পাও?'

‘ভদ্রলোক?’ স্টিরফোর্ড মহা বিস্মিত হবার ভান করে বলল, ‘ভদ্রলোকটি কোথায় বলুন তো?’

‘স্টিরফোর্ড, একজন হতভাগ্য মানুষকে এভাবে অপমান করে তুমি খুব ইতর ব্যবহার করলে। তুমি খুব অভদ্র আচরণ করলে, স্টিরফোর্ড।’ বলতে বলতে মেল সাহেব আমার পিঠে আলতো করে চাপ দিয়ে বললেন, ‘কপার-ফিল্ড, পড়া বলে যাও।’

স্টিরফোর্ড বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, ‘শুনুন, একজন ভিখেরির মুখে এরকম কথা মোটেই মানায় না।’

হঠাৎ ঘরের ভেতর ক্রিকল সাহেবের ফ্যাসফেসে গলায় আওয়াজ গর্জে উঠল, ‘মেল সাহেব, কী হচ্ছে?’ মেল সাহেব চমকে উঠলেন। স্টিরফোর্ড বলল, ‘স্যার, আমার প্রতি নাকি এখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়—মেল সাহেবের এই কথায় আমি প্রতিবাদ করছিলাম।’

‘পক্ষপাতিত্ব?’ ফ্যাসফেসে গলায় যতটা সম্ভব হুংকার ছেড়ে ক্রিকল সাহেব বললেন, ‘আমার স্কুলে পক্ষপাতিত্বের বদনাম? আপনি কী বলতে চান মেল সাহেব?’

মেল সাহেব মাথা নিচু করে বললেন, ‘আমি খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছি, স্যার, ঠান্ডা মাথায় থাকলে ও-রকম কথা বলতাম না।’

মেল সাহেব বিনীত হলেও স্টিরফোর্ডের উত্তেজনা কিন্তু বেড়েই চলে, সে বলে, ‘স্যার, আমাকে ইতর বলা হয়েছে, অভদ্র বলা হয়েছে, তাই আমি রেগে গিয়ে তাঁকে ভিখেরি বলেছি।’

মেল সাহেব আমার পিঠে আস্তে আস্তে হাতের চাপ দিয়েই চলেছেন, তিনি যেন আমার কাছে আশ্রয় চাইছিলেন। ক্রিকল সাহেব বললেন, ‘ভিখারি? মেল সাহেব ভিক্ষে করেন কোথায়?’

‘তিনি ভিক্ষে না-করলেও তাঁর নিকট আত্মীয় তো করেন, একই হলো।’ বলতে বলতে স্টিরফোর্ড আমার দিকে তাকায়। মেল সাহেব তখনো আমার ঘাড়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছেন। লজ্জায়, অনুতাপে, আফসোসে আমি মাথা নিচু করে থাকি, আমিই একদিন কথায় কথায় মেল সাহেবের মায়ের গল্প করেছিলাম, তিনি যে দাতব্য আলয়ে বাস করেন সে কথাটিও বলা হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ নিচের দিকে, মেল সাহেব কিন্তু আমার ঘাড়ে আদর করে আস্তে আস্তে চাপ দিয়েই চলেছেন। এর মধ্যে স্টিরফোর্ড বলেই ফেলল, ‘মেল সাহেবের মা দাতব্য আলয়ে অন্যের খয়রাতের ওপর বেঁচে থাকেন।’ মেল সাহেব তখন ওই সুন্দর বালকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেক কষ্টে ক্রিকল সাহেব উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, ‘আমার এই প্রতিষ্ঠানে তো এরকম লোককে থাকতে দেওয়া যায় না।’ ক্রিকল সাহেবের কপালের রগ দপ করে ফুলে উঠল, তিনি বললেন, ‘আপনি কি এটা একটা দাতব্য স্কুল ভেবেছেন? আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে গিয়ে আমাদের অপমান থেকে অব্যাহতি দিন।’

মেল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আর সময় নেই।’

তাঁর সমস্ত সম্বল যা ছিল, কয়েকটি বই এবং তাঁর বাঁশিটি নিয়ে মেল সাহেব আমাদের স্কুল থেকে চলে গেলেন। ওই রাত্রেও স্টিরফোর্ডকে গল্প শোনাতে শোনাতে আমি মেল সাহেবের বাঁশির বিষণ্ন সুর শুনতে পাচ্ছিলাম। রাত অনেক হলে স্টিরফোর্ড ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম যে এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য কোথাও বসে মেল সাহেব যেন বিষাদাচ্ছন্ন সুরে এক নাগাড়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন। আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম।

(সংক্ষেপিত)

২০২১

লেখক-পরিচিতি

চার্লস ডিকেন্সের পুরো নাম চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেন্স। তিনি উনিশ শতকের শক্তিমান ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁর জন্ম ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথে। ডিকেন্স তার জীবদ্দশায়ই পূর্বসূরি লেখকদের তুলনায় অনেক জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পরও সারা পৃথিবীতে তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। চার্লস ডিকেন্সের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে 'অলিভার টুইস্ট', 'অ্যা টেল অফ টু সিটিজ', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স', 'হার্ড টাইমস' প্রভৃতি। গভীর জীবনানুভূতি, বাস্তবতাবোধ ও মানবিকতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

রূপান্তরকারী-পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর জন্ম ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে গাইবান্ধা জেলায়। 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' উপন্যাস এবং 'অন্যঘরে অন্যস্বর', 'দুধভাতে উৎপাত', 'দোজখের ওম' প্রভৃতি তাঁর ছোটোগল্প-গ্রন্থ। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসের প্রথম অংশের ভাবানুবাদমূলক সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক বালকের জীবনের করুণ গল্প। মাত্র ছয় মাস বয়সে ডেভিড তার বাবাকে হারায়। ছোটোবেলা থেকেই ডেভিড ছিল অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ। তার মায়ের নাম ছিল ক্লারা। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে ভালোই যাচ্ছিল ডেভিডের দিনগুলো, কিন্তু আটবছর বয়সে জীবনে নেমে এল নিপীড়ন। মা ক্লারা বিয়ে করলেন নিষ্ঠুর স্বভাবের ব্যক্তি মার্ডস্টোনকে। তার বোন মিস মার্ডস্টোনও বদমেজাজি। বিনা কারণে ডেভিডের ওপর রুষ্ট ছিলেন তার সৎবাবা ও মিস মার্ডস্টোন। মা ও কাজের মেয়ে পেগোটিই ছিল ডেভিডের ভালোবাসার মানুষ। ডেভিডকে লন্ডনের এক আবাসিক স্কুলে ভর্তির জন্য পাঠানো হলে সেখানেও সে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। তবে সেই জীবনে হৃদয়বান মানুষেরও দেখা পেল সে। তার ভালো লাগল নিরীহ ধরনের শিক্ষক মেল সাহেবকে। কিন্তু সে মেল সাহেবও টিকতে পারলেন না মানুষের মন্দ স্বভাবের জন্য।

ডেভিডের জীবন থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

জুলফি	— কানের পাশ দিয়ে গালের ওপর এলিয়ে পড়া চুল।
বরদাশত	— সহ্য।
‘রডারিক র‍্যানডম’	— টবিয়াস স্মলেট রচিত রোমাঞ্চ-উপন্যাস।
‘টম জোনস’	— হেনরি ফিল্ডিংসের লেখা উপন্যাস।
‘দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড’	— অলিভার গোল্ডস্মিথের বিখ্যাত উপন্যাস।
‘ডন কুইকসোট’	— স্পেনীয় লেখক সার্বেন্তেজের লেখা উপন্যাস।
‘রবিনসন ক্রুসো’	— ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা উপন্যাস।
‘আরব্য রজনী’	— আরবীয় লোকগাথার বই।
বাজখাঁই	— কর্কশ।
এ্যায়সা	— এমন।
মুহুর্মুহু	— একনাগাড়ে।
এক্কাগাড়ি	— দুই চাকা বিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ি।
জনাকীর্ণ	— জনবহুল, বহুলোক আছে এমন।
সসপ্যান	— কড়াই। ইংরেজি Saucepan.
গোগ্রাসে	— তাড়াহুড়া করে। গরুর মতো একত্রে অধিকপরিমাণ খাদ্য গলাধঃকরণ।
ঠাট্টা-বিদ্রূপ	— হাসি-তামাশা।
রিপোর্ট	— প্রতিবেদন, বিবরণ। এখানে অভিযোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
ঝক্কি	— ঝামেলা, বিপদ।
হুঙ্কার	— গর্জন।
খয়রাত	— দান।
সম্বল	— অবলম্বন।
বিষাদাচ্ছন্ন	— বিষণ্নতায় ছেয়ে গেছে এমন।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. ‘আমার সমস্ত বেদনার কথা যেন খুঁড়ে ওপরে উঠে এল।’ কথাটি ব্যাখ্যা করো।

খ. ধৈর্য সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়। ‘ডেভিড কপারফিল্ড’ গল্পের আলোকে এ মন্তব্যের যথার্থতা তুলে ধরো।

মুক্তি

অ্যালেক্স হ্যালি
অনুবাদ : গীতি সেন

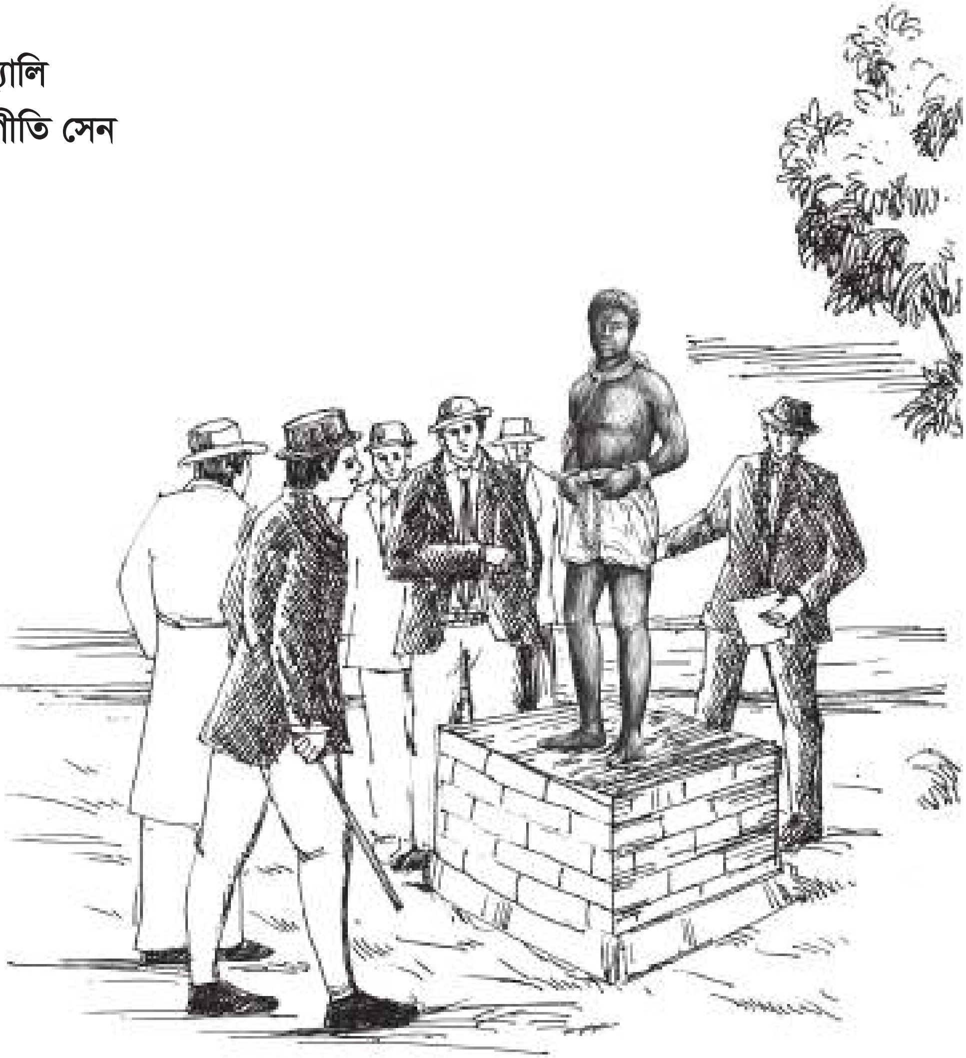

সকালের খাবার দেবার পর দুজন সাদা মানুষ একবোঝা জামা-কাপড় হাতে ঘরে ঢুকল। ভীত বন্দিদের বাঁধন খুলে দিয়ে সেগুলো কী করে পরতে হয় দেখিয়ে দেওয়া হলো। একটা বস্ত্রে পা থেকে কোমর পর্যন্ত, অন্য একটায় ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকতে হয়। কুন্টার ঘাগুলো সেরে এসেছিল। জামা-কাপড় পরামাত্র সেগুলো চুলকাতে শুরু করল। বাইরে লোকজনের কথাবার্তার কোলাহল ক্রমে বাড়ছিল। ক্রমশই লোক জমছিল। কুন্টারা জামাকাপড় পরে বিমূঢ় হয়ে বসেছিল– কী জানি এর পরে কপালে কী আছে!

সাদা মানুষদুটো ফিরে এসে প্রথমে রাখা বন্দিদের মাঝে তিনজনকে বার করে নিয়ে গেল। তারপরেই বাইরের আওয়াজের ধরনটা বদলে গেল। কুন্টা অবাক হয়ে কতকগুলো অবোধ্য চিৎকার শুনছিল।

'নিখুঁত স্বাস্থ্য! অফুরন্ত কর্মশক্তি।'

অন্য কোনো সাদা মানুষের গলা–

'তিনশো পঞ্চাশ!'
'চারশো!'
প্রথম সাদা মানুষটির চিৎকার শোনা গেল, 'ছয়! কে ছয় বলবেন? তাকিয়ে দেখুন। দুর্দান্ত কর্মক্ষমতা!'
কুন্টা ভয়ে শিউরে উঠছিল। তার মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। যখন চারজন সাদা মানুষ ঘরে ঢুকল—সে যেন অসাড়! কুন্টাকে স্পর্শ করতে সে রাগে ভয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

তখনই মাথায় একটা প্রবল আঘাত পেয়ে তার বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। সচেতন হয়ে উঠতে দেখতে পেল—উজ্জ্বল দিবালোকে আরো দুজনের সঙ্গে সেও বাইরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে শত শত সাদা মানুষ হা-করে তাকিয়ে আছে। তারই মাঝে দুটো কালো মানুষ শিকল হাতে দাঁড়িয়ে। মুখের ভাব দেখে মনে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা একান্ত উদাসীন। চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, লক্ষ্যহীন।
'সদ্য গাছ থেকে পেড়ে আনা।'
'বাঁদরের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন!'
'সবকিছু শিখিয়ে নেওয়া যাবে!'

সাদা মানুষটা পায়চারি করতে করতে হাত নেড়ে কুন্টার আপাদমস্তক নির্দেশ করে কথাগুলো চিৎকার করে বলছিল। তারপর কুন্টাকে জোর করে ঠেলে সামনে একটা বেদির মতো উঁচু জায়গায় ওঠাল।
'একেবারে সরেস! নিজের ইচ্ছামতো গড়ে নেওয়া যাবে!'
কুন্টা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষও করেনি কখন চারদিকের লোকজন এগিয়ে এসে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে।
'তিনশো ডলার!'—'তিনশো পঞ্চাশ!'
'পাঁচশো!' 'ছয়!'
সাদা মানুষটা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠল—'বাজারের সেরা। তরুণ যুবা। কেউ কি সাড়ে সাত বলবেন?'
একজন চেঁচিয়ে উঠল—
'সাড়ে সাত!'
'আট! আট!'
ডাক উঠল—'আট!' আর কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই আবার শোনা গেল—'সাড়ে আট।'
ডাক আর চড়ল না।
যে সাদা মানুষটা এদিক থেকে চেঁচাচ্ছিল, সে কুন্টার শিকল খুলে নিয়ে তাকে সামনে একজনের দিকে ঠেলে দিল। এই নতুন সাদা মানুষটার পেছনে একজন কালো লোক। শিকলের প্রান্তটা তারই হাতে দেওয়া ছিল। তার প্রতি কুন্টার অনুনয়পূর্ণ চাহনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। সে লক্ষ্যহীন নির্বিকার দৃষ্টিতে কুন্টাকে শিকলসুদ্ধ টেনে একটা চার চাকার বাক্সের সামনে নিয়ে এল। বাক্সটার সামনে একটা বিরাট গাধাজাতীয় পশু। কালো লোকটা রূঢ়ভাবে কুন্টাকে বাক্সের মেঝেতে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিকলটা কোথায় আটকে দিল। কিছুক্ষণ পরে কুন্টা গন্ধে অনুভব করল— সাদা মানুষটা ফিরে এসেছে। সে গাড়ির ওপরে চড়ে বসতে, কালো লোকটিও সামনের সিটের মাথায় উঠে বসে একটা চামড়ার ফিতে পশুটার পিঠে আছড়ে ফেলল। অমনি বাক্সটা গড়িয়ে চলতে শুরু করল।

কুন্টা শিকলটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। বড়ো ক্যানুতে তাদের যে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, তার থেকে এটা হালকা ধরনের। প্রাণপণে চেষ্টা করলে কি ছেঁড়া যাবে না? কিন্তু এখন গাড়ি থেকে লাফাবার উপযুক্ত সময় নয়।

কুন্টা একবার মাথা তুলে সাদা মানুষটার দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে সেও পেছন ফিরে তাকাতে তাদের চোখাচোখি হয়ে গেল। ভয়ে কুন্টার দেহ হিম। কিন্তু সাদা মানুষটার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিল না।

পথের ধারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। বিভিন্ন রঙের শস্য দেখা যাচ্ছে। তার মাঝে ভুট্টা সে চিনতে পারল। জুফরেতে ফসল কাটবার সময় যেমন দেখতে হয়, তেমনি। খানিকক্ষণ পর সাদা মানুষ এবং কালোটি দুজনেই শুকনো রুটি আর মাংস বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। কুন্টার খুবই খিদে পেয়েছিল। খাদ্যের সুগন্ধে তার জিভে জল এসে গেল। তবুও সামনের কালো লোকটি যখন পেছন ফিরে তাকে এক টুকরো রুটি দিতে চাইল, সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে আর একটি গাড়ি বিপরীত দিকে ছুটে গেল। গাড়িটির পেছনে চরম ক্লান্তিভরে দ্রুত পদক্ষেপে চলছিল মোটা কাপড়ের পুরোনো ছেঁড়া পোশাক-পরা সাতটি কালো মানুষ। তাদের মুখে গভীর হতাশার ছাপ। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে কুন্টাদের গাড়িটা পাশের ছোটো রাস্তায় ঢুকে পড়ল। দূরে গাছের ফাঁকে একটা বিরাট সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এবার কী হবে? এখানেই কি তাকে হত্যা করে খাওয়া হবে?

বাড়িটার কাছে এসে কুন্টা আরো কালো মানুষের গন্ধ পেল। অন্ধকারের ভেতর তিনটি মানুষের আকার বোঝা যাচ্ছিল। একজনের হাতে আলো ঝোলানো। বড়ো ক্যানুর অন্ধকার খোলের ভেতর এ ধরনের আলো কুন্টা দেখেছে। কেবল এটার চারপাশে একটা স্বচ্ছ চকচকে আবরণ, তার ভেতর দিয়ে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। কালো লোকগুলোর পাশ দিয়ে একটা সাদা মানুষ এগিয়ে এল। গাড়িটা থেমে যেতে একজন আলোটা উঁচু করে ধরল। ভেতরের সাদা মানুষটা নেমে এসে নতুন লোকটার সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর দুজনে হাসিমুখে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কুন্টার মনে একটু আশা হলো। এবার কালো লোকেরা তাকে ছেড়ে দেবে না? কিন্তু এ কেমন কালো লোক? তারা তাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে! নিজের স্বজাতির লোক নিয়ে এরা পরিহাস করছে? ছাগলের মতো সাদা মানুষের হুকুমে কাজ করে? এদের আফ্রিকাবাসীর মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এরা কখনো তা হতে পারে না।

গাড়িটা কুন্টাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। অন্য কালো লোকগুলো হাসাহাসি করতে করতে পাশে পাশে চলল। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা থামতে, চালক নেমে এসে শিকলের অপর প্রান্ত খুলে রূঢ় ভঙ্গিতে টান মেরে কুন্টাকে নামতে ইঙ্গিত করল।

লোকগুলো জোর করে তাকে নামাল। তারপর একটা খুঁটির সঙ্গে শিকলটা আবার বেঁধে দিল। কুন্টা দৈহিক যন্ত্রণা, ত্রাস, ক্রোধ ও ঘৃণাতে কাতর হয়ে সেখানে পড়ে থাকল। একজন তার সামনে এক পাত্র জল ও এক পাত্র খাদ্য নামিয়ে রাখল। খাদ্যটা যেমন অদ্ভুত দেখতে, তেমনি অদ্ভুত তার গন্ধ। তবুও তা দেখেই কুন্টার রসনা

লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু কুন্টা মুখ ফিরিয়েই থাকল। কালো লোকগুলো তা দেখে আবারও বিদ্রূপের হাসি হাসল। গাড়ির চালক আলোটা তুলে ধরে মোটা খুঁটির কাছে গিয়ে শিকলটা জোরে টেনে কুন্টাকে দেখিয়ে দিল—ওটা ছেঁড়া যাবে না। তারপর খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে শাসানির ভঙ্গি করল। সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল।

কুন্টা অপেক্ষা করতে লাগল—কখন সবাই ঘুমোবে, কখন সে পালাবার সুযোগ পাবে। এরই মধ্যে একটা কুকুর এসে তার খাবারের পাত্র খালি করে দিয়ে গেল। রোষে কুন্টার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে খানিকটা জলপান করে নিল। কিন্তু তাতে শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না।
পালাবার অদম্য ইচ্ছা অতি কষ্টে দমন করে সারারাত সে জেগে কাটাল। সে জানে শিকল ভাঙবার চেষ্টা করলেই ঝনঝনানির শব্দে পাশের কুটিরের লোক ছুটে আসবে। ইতোমধ্যেই কুকুরের ডাকে গাড়ির চালকটি একবার বেরিয়ে এসে শিকল পরীক্ষা করে গিয়েছে।

পুবের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। কুন্টা আর একটু জল পান করল। এমন সময় সেই কালো লোক চারটে দ্রুত পায়ে এসে কুন্টাকে টেনে তুলে আবার সেই গড়ানো বাক্সের মতো গাড়িটাতে চড়ে বসল। তারপর গাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে আগের দিনের মতই চলল। কুন্টার দুই চক্ষু অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় সামনের মানুষগুলোর পিঠের ওপর অগ্নিবর্ষণ করতে থাকল। যদি এদের খুন করা যেত! কিন্তু বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে। মাথা গরম করলে চলবে না। অযথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই।
কিছু দূর গিয়ে ঘন বন দেখা গেল। কতক জায়গায় গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। আবার কিছু জায়গায় জঙ্গল পোড়ানো হচ্ছে। ধূসর বর্ণ ধোঁয়ার রাশি উঠছিল। সাদা মানুষরাও কি জুফরের মতো গাছপালা পুড়িয়ে জমির ফলন শক্তি বৃদ্ধি করে?

আরো খানিকটা দূরে কাঠের তৈরি একটি ছোট্ট চৌকো কুটির, আর তার সামনে পরিষ্কার একখণ্ড জমি। একটা ষাঁড়ের পেছনে বাঁকানো হাতলওয়ালা কী একটা মস্ত জিনিস। একজন সাদা মানুষ হাতল দুটো চেপে ধরেছে। তাতে পেছনের মাটি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আরো দুটো রোগামতন সাদা মানুষ গাছের নিচে উবু হয়ে আছে। তিনটে রোগা-পটকা শুয়োর আর কিছু মুরগি চারপাশে ছুটোছুটি করছে। কুটিরের দরজায় একটি লাল চুলের সাদা মেয়ে মানুষ। তিনটে সাদা বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছিল। তারা গাড়িতে কুন্টাকে দেখে হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল। কুন্টার ভাব দেখে মনে হলো সে হায়েনা শিশু দেখছে! এতদিনে সে সত্যি একটি সাদা মানুষের পুরো পরিবার দেখতে পেল। পথে যেতে যেতে আগেকার মতো আরো দুটি মস্ত সাদা বাড়ি দেখা গেল। প্রত্যেকটির ওপর দিকে একটার ওপর আর একটা চাপানো—দুটো বাড়ির সমান। প্রত্যেকটিরই কাছাকাছি বেশ কিছু ছোটো ছোটো অন্ধকার কুটির। কুন্টা আন্দাজ করল—সেগুলোতেই কালো লোকেদের বাস। আর চারপাশ ঘিরে বিস্তীর্ণ তুলোর খেত। অল্পদিন আগে ফসল তোলা হয়েছে। তখনও গোছা-গোছা তুলো চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো।

পথে কুন্টা আর একটি অদ্ভুত জিনিসের দেখা পেল। রাস্তার ধার দিয়ে দুজন বিচিত্রদর্শন লোক যাচ্ছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল—তারা বুঝি কালো। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল তাদের গায়ের রং কেমন লালচে বাদামি। দীর্ঘ কালো চুল দড়ির মতো পাকানো হয়ে পেছনে ঝুলছে। হালকা জুতো পায়ে, কোমরে সম্ভবত চামড়ার তৈরি এক ধরনের আচ্ছাদন ঝুলিয়ে লোক দুটো দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। সঙ্গে তির-ধনুক। তারা সাদা মানুষ নয়। আবার আফ্রিকাবাসীও নয়। তাদের গায়ের গন্ধই আলাদা। গাড়ি দেখে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না।

পুরো দুদিন উপবাসের পর কুন্টার দুর্বল লাগছিল। চারিদিকে কী ঘটছে সে বিষয়ে তার আর উৎসাহ ছিল না। কিছু সময় পরে গাড়ির চালক বাক্সের পাশে একটা আলো ঝুলিয়ে দিল। আবার খানিকটা পর সাদা মানুষটা কী যেন বলাতে গাড়ির চালক কুন্টার দিকে একটা চাদর ছুঁড়ে দিল। নিজেরাও গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল। কুন্টা শীতে কাঁপছিল। কিন্তু ওদের দেওয়া চাদর সে কিছুতেই ব্যবহার করবে না। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আবার গায়ের চাদর দেবার বদান্যতা কেন? কালো লোকটাকেও বলিহারি! সে-ই অগ্রণী হয়ে সাদা মানুষটাকে এসব কাজে সাহায্য করছে! কুন্টাকে পালাতেই হবে। না-হয় সে চেষ্টাতে তার প্রাণটাই যাবে। জীবনে আর কখনো জুফরে দেখবার সৌভাগ্য হবে না। যদি হয়, তবে সে গাম্বিয়ার ঘরে ঘরে সাদা মানুষের এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার কাহিনি বলবে।

গাড়িটা বড়ো রাস্তা থেকে এবার একটা ছোটো রাস্তায় ঢুকল। দূরে আর একখানা ভূতুড়ে সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্রে আবার কপালে কী আছে কে জানে। কুন্টা বাড়ির সামনে পৌঁছেও সাদা বা কালো মানুষের কোনো চিহ্ন বা গন্ধ পেল না। সাদা মানুষটা গাড়ি থেকে নেমে কয়েকবার আড়মোড়া ভেঙে শরীরের আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিল। তারপর সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটা আরো খানিকটা এগিয়ে একটা কুটিরের সামনে দাঁড়াল। গাড়ির চালক কোনোক্রমে নিজেকে ওপর থেকে নামিয়ে নিল। বাতিটা হাতে নিয়ে অতি কষ্টে পা টেনে টেনে ঘরের দিকে রওয়ানা দিয়ে কী যেন ভেবে ফিরে এল। গাড়ির সিটের নিচে হাত বাড়িয়ে শিকলটা খুলে নিয়ে সে আবার যাবার উপক্রম করল। কুন্টা সঙ্গে আসবে না দেখে শিকল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ স্বরে কিছু বলে উঠল। মুহূর্তে কুন্টা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড পরাক্রমে হায়নার শক্তিশালী চোয়ালের মতো কঠিন হাতে তার কণ্ঠনালি টিপে ধরল। বাতিটা মাটিতে পড়ে গেল। কালো লোকটার গলা দিয়ে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বেরোল। সে তার বলিষ্ঠ দুই হাতে কুন্টার মুখে ও বাহুতে যথাসাধ্য আক্রমণ চালাল। কিন্তু কুন্টার গায়ে তখন অযুত হাতির বল। সে নিজের শরীর বাঁকিয়ে শত্রুর ঘুষি, হাঁটুর গুঁতো, পায়ের লাথি এড়াবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হাতের চাপ শিথিল হতে দেয়নি। অবশেষে লোকটার গলায় একটা ঘরঘর শব্দ হতে থাকল। তার শক্তিহীন নিঃসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কুন্টা ভূলুণ্ঠিত দেহ আর উলটে-পড়া বাতির কাছ থেকে দ্রুতবেগে সরে গেল। খেতের অসমান কর্কশ জমির ওপর দিয়ে সে নিচু হয়ে দৌড়াতে লাগল। এতদিনের অব্যবহারে শরীরের পেশিগুলো যন্ত্রণায় প্রচণ্ড আর্তনাদ করছিল। কিন্তু ঠান্ডা হাওয়াতে তার আরাম বোধ হচ্ছিল। আর মুক্তির আনন্দে সর্বদেহ মন আতশবাজির মতো ফেটে পড়তে চাইছিল।

লেখক-পরিচিতি

আলেক্স হ্যালি একজন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক। তিনি জন্মেছেন ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। 'Roots' বইটির জন্যই মূলত তাঁর বিশ্বজুড়ে খ্যাতি। এই উপন্যাসের গল্প নিয়েই পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজ। হ্যালি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুবাদক-পরিচিতি

গীতি সেনের জন্ম কুমিল্লায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর সপরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। 'শেকড়ের সন্ধানে' তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি আলেক্স হ্যালির 'Roots' উপন্যাসের অংশবিশেষের অনুবাদ। গল্পাংশে আফ্রিকার গাম্বিয়া নামক দেশের একটি গ্রাম জুফরে। কুন্টা সেই গ্রামের অধিবাসী। কালো এই মানুষটিকে ধরে নিয়ে এসেছে সাদা আমেরিকানরা। দাস হিসেবে তাকে বিক্রি করা হবে। পোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে দাস বাজারে তাকে বিক্রি করা হলো সাড়ে আটশ ডলারে। কুন্টা তরুণ, যুবক। বাজারে তার মূল্য বেশি। কেননা তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয়া যাবে। ভালো দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল এক সাদা লোক। কুন্টার সঙ্গে তারা খুব দুর্ব্যবহার করল, অপমান করল। সে দেখতে পেল তার মতোই অনেক কালো আছে দাসবাজারে কিংবা সাদা মানুষদের বাড়িতে। সাদাদের জন্য কাজ করছে। কুন্টার মনের ভেতর শুধু পালাবার ইচ্ছা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকল সে। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সাদা লোকদের কোনো এক বাড়িতে। রাত্রিবেলা পৌঁছল সেই বাড়ি। সাদা লোকটি যখন গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িচালকের ওপর। প্রচণ্ড আক্রোশে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল তাকে। লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পালিয়ে গেলো কুন্টা। তার শরীর ও মনে তখন মুক্তির প্রবল আনন্দ। আফ্রিকার ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন সাদারা কালোদের বন্দি করে বিভিন্ন দেশের দাস বাজারে বিক্রি করত। 'মুক্তি' গল্পটিতে দাসব্যবসার একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে তরুণ কুন্টা তার বুদ্ধি, সাহস ও শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

গল্পটিতে জাতিগত ও বর্ণগত নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবার তীব্র বাসনারই প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

ঊর্ধ্বাঙ্গ — শরীরের ওপরের অংশ।

বিমূঢ় — হতবুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

রুদ্ধ — বন্ধ।

দিবালোক — দিনের আলো।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা — চারপাশের অবস্থা।

নির্লিপ্ত — কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই এমন।

আপাদমস্তক — পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

সরেস — খাঁটি।

২০২৫

অনুনয় — অনুরোধ।

ক্যানু — নৌকা-জাতীয় জলযান। ইংরেজি Canoe.

শাসানো — ভয় দেখানো।

রোষ — ক্ষোভ।

প্রত্যুষ — ভোর।

আন্দাজ — অনুমান।

বিচিত্রদর্শন — দেখতে উদ্ভট।

আচ্ছাদন — আবরণ।

ভ্রূক্ষেপ — তাকানো বা লক্ষ করা।

উপবাস — না-খেয়ে থাকা।

বদান্যতা — উদার, দরদি ভাব।

বলিহারি — চমৎকার।

অগ্রণী — প্রধান নেতা, শ্রেষ্ঠ। এখানে 'আগ বাড়িয়ে' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আড়মোড়া — আলস্য ভাব।

আড়ষ্টতা — জড়তা।

পরাক্রম — বল, বীরত্ব।

ভূলুণ্ঠিত — মাটিতে পড়ে যাওয়া।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. 'একেবারে সরেস! নিজের ইচ্ছামতো গড়ে নেওয়া যাবে' কোন প্রসঙ্গে এবং কেন এ কথা বলা হয়েছে?

খ. 'মুক্তি' গল্পটিতে জাতিগত ও বর্ণগত যে প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে তার চিত্র তুলে ধরো।

২। ক. 'কিন্তু এ কেমন কালো লোক?' কোন প্রসঙ্গে এবং কেন এ কথা বলা হয়েছে?

খ. তরুণ কুন্টা তার বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে– তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? যুক্তি দাও।

ফিলিস্তিনের চিঠি

ঘাসান কানাফানি

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

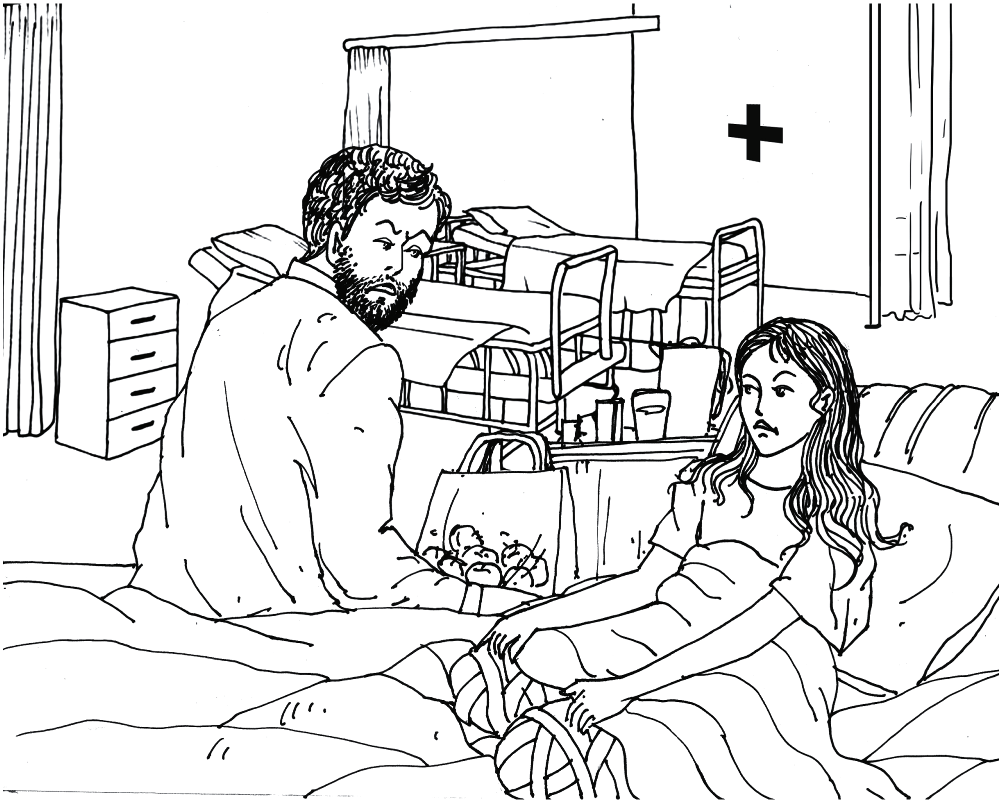

প্রিয় মুস্তাফা

এক্ষুনি তোর চিঠি পেলাম। তাতে তুই আমায় লিখেছিস যে, তোর ওখানে থাকবার জন্য যা যা করা জরুরি ছিল, সব তুই করে ফেলেছিস। আমি এই খবরও পেয়েছি যে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইনজিনিয়ারিং বিভাগে আমাকে নেওয়া হয়েছে। তুই আমার জন্যে যা করেছিস, দোস্ত, সবকিছুর জন্যে তোকে ধন্যবাদ, শুকরিয়া। তবে এটা নিশ্চয়ই তোর কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকবে যখন আমি এ খবরটা দেবো—না দোস্ত, আমি আমার মত পালটেছি। আমি তোকে অনুসরণ করে সেই দেশে যাব না, যে দেশ 'শ্যামল, সজল আর সুশ্রী সুন্দর সব মুখে ভরা'—যেমন তুই লিখেছিস। না, আমি এখানেই থাকব। কোনোদিন এদেশ ছেড়ে যাব না।

আমি কিন্তু সত্যি বড্ড অস্বস্তিতে আছি, মুস্তাফা। আমাদের জীবন আর কখনোই এক খাতে বয়ে যাবে না। অস্বস্তির কারণ, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি তুই আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিস—কী রে, আমরা না কথা দিয়েছিলাম সব সময় একসঙ্গে থাকব, যেমন আমরা চিরকাল একসঙ্গে বলে উঠতাম, 'আমরা বড়োলোক হবোই! আমাদের অনেক টাকা হবে!' কিন্তু দোস্ত, কিছুই আর আমার করার নেই। হ্যাঁ, আমার এখনও সেদিনটা মনে পড়ে যেদিন কায়রোর বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আমি তোর হাত চেপে ধরেছিলাম।

তুই বলছিলি, 'উড়োজাহাজ ছাড়বার আগে আরো পনেরো মিনিট সময় আছে হাতে। অমনভাবে হা করে আকাশে তাকিয়ে থাকিস না। শোন। পরের বছর তুই কুয়েত যাবি। মাইনে যা পাবি তা থেকে যথেষ্ট টাকা বাঁচাতে পারবি। ফিলিস্তিনের মাটি থেকে শেকড় ওপড়াতে তাই যথেষ্ট। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে নতুন করে শেকড় পুঁতবি। আমরা একসঙ্গে সব শুরু করেছি, আর একসঙ্গেই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের...'

সেই মুহূর্তে আমি তোর ঠোঁটের দ্রুত নড়াচড়া দেখছিলাম, মুস্তাফা। তোর কথা বলবার ধরনটাই ছিল ওরকম, দাঁড়ি-কমা বাদ দিয়ে হড়বড় করে তোড়ে বলে চলা। কিন্তু আবছাভাবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল তোর এই পালানোতে তুই পুরোপুরি সুখী না। পালাবার তিনটে ভালো কারণ তুই দেখাতে পারিসনি। আমিও সর্বক্ষণ এই আক্ষেপে ভুগেছি। কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট চিন্তাটা ছিল—এই গাজাকে ছেড়ে সবাই মিলে পালিয়ে যাই না কেন আমরা? কেন যাই না? কেন পারি না? তোর অবস্থা অবশ্য ভালো হতে শুরু করেছিল। কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তোকে কনট্রাক্ট দিয়েছিল, যদিও আমাকে দেয়নি। যে দুরবস্থার দাবনার মধ্যে আমি গড়াগড়ি যাচ্ছিলাম, সেটা যেন আর পালটাবেই না। তুই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু টাকা পাঠাতিস। তুই চেয়েছিলি আমি যেন ঋণ হিসেবেই তা গ্রহণ করি, কারণ তোর ভয় ছিল নয়তো আমি অপমানিত বোধ করব। আমার বাড়ির হালচাল তো তুই জানতিস। তুই জানতিস, স্কুলের চাকরিতে আমি যে সামান্য মাইনে পেতাম, তাতে আমার আম্মা, আমার ভাবি, আর তার ছেলেমেয়েসহ সংসারটা চালানোই অসম্ভব ছিল।

পরে কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকেও কনট্রাক্ট দিয়েছিল। আমি তোকে সবকিছু জানিয়েই চিঠি লিখতাম। সেখানে আমার বেঁচে থাকাটা ছিল কেমন একটা চটচটে ফাঁকা দমবন্ধ দশা। আমার গোটা জীবনটাই কেমন যেন পিচ্ছিল হয়ে গেছে, মাসের গোড়া থেকেই পরের মাস পয়লার জন্যে একটা উগ্র বাসনা আমায় কুরে কুরে খায়। সেই বছরটার মাঝামাঝি, ফিলিস্তিনে বোমা হামলা হয়। ঘটনাটা আমার রুটিন খানিকটা পালটে দিয়ে থাকবে—তবে সেদিকে নজর দেবার খুব একটা ফুরসত বা উপায় আমার ছিল না। এই ফিলিস্তিন পেছনে ফেলে রেখে আমি চলে যাব ক্যালিফোর্নিয়া, নিজেকে নিয়ে নিজে বাঁচব, আমার এই হতভাগা বেচারি জীবন কত ভুগেছে, কত সয়েছে!

আম্মা, ভাবি আর তার বাচ্চাদের জন্যে সামান্য টাকা পাঠাতাম আমি, যাতে তারা কোনোক্রমে টিকে থাকতে পারে। তবে এই শেষ বন্ধনটাও আমি ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করে ফেলব—সবুজ ক্যালিফোর্নিয়ায়। এই হার, এই পরাজয়ের পচা গন্ধ থেকে বাঁচাব নিজেকে। যে সহানুভূতি, যে সমব্যথা আমাকে আমার ভাইজানের বাচ্চা-কাচ্চাদের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তাদের আম্মা আর আমারও আম্মা—এরা কেউই কোনোকালে এই খাড়াই থেকে আমার উড়াল ঝাঁপকে কোনো মানে দিতে পারবে না। অনেক দিন কেটেছে—আর এই পিছুটান টানাহেঁচড়া চলবে না। আমাকে পালাতে হবে। এসব অনুভূতি তোর চেনা, মুস্তাফা, কারণ তোরও তো সত্যি এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যখন আমি জুন মাসে ছুটিতে গেলাম। আমার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি জড়ো করলাম এক জায়গায়। মধুর পলায়নের জন্যে উদ্‌বেল হয়ে উঠলাম। কিন্তু কী সেই অস্পষ্ট আবছায়া যা কোনো লোককে তার পরিবারের কাছে টেনে নিয়ে আসে? মুস্তাফা, আমি জানি না। আমি শুধু জানি—আমি আম্মার কাছে গিয়েছি, আমাদের বাড়িতে সেদিন সকালবেলায়। আমি যখন গিয়ে পৌঁছেছি, আমার ভাবি, আমার মরহুম ভাইজানের স্ত্রী, আমার সঙ্গে দেখা করল। আর ফুঁপিয়ে বলল, তার মেয়ে নাদিয়া জখম হয়ে গাজার হাসপাতালে আছে, আমাকে দেখতে চায়। আমি কি তাকে দেখতে যাব সেদিন সন্ধ্যাবেলা? তোর মনে আছে নাদিয়াকে, তেরো বছর বয়েস, আমার ভাইয়ের মেয়ে?

সেদিন সন্ধ্যেয় আমি এক পাউন্ড আপেল কিনে নিয়ে নাদিয়াকে দেখতে হাসপাতালের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। আমি জানতাম কিছু একটা রহস্য আছে। আমার আম্মা আর আমার ভাবি আমার কাছে যা চেপে গিয়েছে, এমন একটা কিছু যা তারা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। নাদিয়াকে আমি ভালোবাসতাম নিছক অভ্যাসবশেই, সেই একই অভ্যাস যা আমাকে ভালোবাসিয়েছে তাদের প্রজন্মের সবকিছুকে। সেই যে প্রজন্ম বড়ো হয়ে উঠেছে পরাজয়, হতাশায় আর বাস্তুহীনতায়।

কী ঘটেছিল সেই মুহূর্তে? আমি জানি না মুস্তাফা। খুব শান্তভাবেই আমি ঢুকেছিলাম ধবধবে সাদা ঘরটায়। নাদিয়া শুয়ে আছে তার বিছানায় একটা মস্ত বালিশে পিঠ দিয়ে, যার ওপর তার চুল কালো এক ঘন পশলার মতো ছড়িয়ে আছে। তার ডাগর চোখ দুটোয় কী রকম একটা ছমছমে গভীর স্তব্ধতা। তার কালো চোখের তারায় টলমল করছে পানি। তার মুখখানি শান্ত নিশ্চল। এখনো বড্ড ছেলেমানুষ আছে নাদিয়া, কিন্তু তাকে দেখাচ্ছে কোনো বাচ্চার চেয়েও বেশি, আরো বেশি, কোনো বাচ্চার চেয়ে বড়ো, অনেক বড়ো।
'নাদিয়া!'
সে তার চোখ তুলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার ক্ষীণ, মৃদু হাসির সঙ্গে আমি তার গলা শুনতে পেলাম।
'চাচা! তুমি কি এক্ষুনি কুয়েত থেকে এলে'?
তার কণ্ঠস্বর কী রকম যেন ভেঙে গেল তার গলায়। দুই হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে সে উঠে বসল। গলাটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি হালকাভাবে তার পিঠ চাপড়ে তার পাশে বসে পড়লাম।
'নাদিয়া! আমি তোর জন্যে কুয়েত থেকে উপহার নিয়ে এসেছি, অনেক উপহার। বিছানা ছেড়ে উঠবি যখন, একেবারে সেরে যেতে হবে কিন্তু, ততদিন আমি সবুর করব। তারপর তুই আমার বাড়ি আসবি আর এক এক করে সব আমি তোকে দেব। তুই যে লাল সালোয়ারগুলো আনতে লিখেছিলি সেগুলো এনেছি। একটা নয়—অনেক।'
মিথ্যে কথা। আমি এমনভাবে কথাগুলো বললাম যেন জীবনে এই প্রথম আমি কোনো পরম সত্য কথা বলছি। নাদিয়া কেঁপে উঠল, ভয়ংকর এক স্তব্ধতার মধ্যে সে তার মাথা নোয়াল। আমি টের পেলাম, তার চোখের জল আমার হাতের পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে।
'কিছু বল, নাদিয়া! লাল সালোয়ারগুলো তোর চাই না?'

সে তার ডাগর চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গেল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল। আমি তার গলা শুনতে পেলাম আবার। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

'চাচা!'

সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আঙুল দিয়ে তুলে ধরল গায়ের সাদা চাদর। আঙুল তুলে দেখাল তার পা, ঊরুর কাছ থেকে কেটে বাদ দেওয়া।

দোস্ত, মুস্তাফা... আমি কোনোদিন নাদিয়ার পা দুটো ভুলব না—ঊরুর কাছ থেকে কাটা। না! হাসপাতাল থেকে সেদিন আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। হাতের মধ্যে মুঠো করা দুটি পাউন্ড, নাদিয়াকে দেব বলে এনেছিলাম। জ্বলজ্বলে সূর্য রাস্তা ভরিয়ে দিয়েছে টকটকে রক্তের রঙে। এই ফিলিস্তিনে সবকিছু দপদপ করছে বিষাদে, মনস্তাপে, যা শুধুই কোনো রোদনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। যুদ্ধের আহ্বান এই বিষাদ। তারও বেশি, এ যেন কাটা পা ফিরে পাবার জন্যে একটা প্রচণ্ড দাবি!

গাজার রাস্তায় রাস্তায় আমি হেঁটে বেড়ালাম। চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরা সব রাস্তা। ওরা আমাকে বলেছে— নাদিয়া তার পা হারিয়েছে, যখন সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ছোটো ছোটো ভাইবোনদের ওপর, তাদের ঢেকে দিয়েছিল নিজের ছোট্ট শরীরটা দিয়ে। বোমা আর আগুন থেকে তাদের বাঁচাতে, যে-আগুনের হিংস্র থাবা তখন বাড়িটায় পড়েছিল। নাদিয়া নিজেকে বাঁচাতে পারত, সহজেই সে ছুটে পালিয়ে যেত পারত লম্বা লম্বা পা ফেলে, রক্ষা করতে পারত তার পা। কিন্তু সে তা করেনি।

কেন?

না, মুস্তাফা, দোস্ত আমার, আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাব না—আর তাতে আমার কোনো খেদ নেই। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে আমরা যা শুরু করেছিলাম, তাও আমরা শেষ করব না। সেই আবছা মতো অনুভূতি যা তুই গাজা ছেড়ে যাবার সময় অনুভব করেছিলি, সেই ছোট্ট বোধটাকে বিশাল হয়ে গড়ে উঠতে দিতে হবে তোর ভেতর। ছড়িয়ে পড়তে দিতে হবে তাকে, নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে হাতড়াতে হবে তোকে, তন্নতন্ন করে তোকে নিজেকে খুঁজতে হবে পরাজয়ের এই ধ্বংসস্তূপে।

আমি তোর কাছে যাব না মুস্তাফা। বরং তুই, তুই আমাদের কাছে ফিরে আয়। ফিরে আয়, মুস্তাফা, নাদিয়ার কাটা পা দুটি থেকে শিখতে, ফিরে আয় জানতে কাকে বলে জীবন, অস্তিত্বের মূল্য কী আর কতটা!

ফিরে আয়, মুস্তাফা, দোস্ত আমার, ফিরে আয়! আমরা সবাই তোর জন্যে অধীর অপেক্ষা করে আছি।

লেখক-পরিচিতি

ঘাসান কানাফানি প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি কথাসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, আক্রায়। লেখাপড়া শেষ করে তিনি প্রথমে সিরিয়ার রাজধানী এবং পরে কুয়েতে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আল-হাদাফ' নামের সাপ্তাহিক পত্র। যা ছিল 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন'-এর মুখপত্র। তিনি উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ইসরায়েলি বাহিনীর গোপন বোমা হামলায় তিনি নিহত হন।

অনুবাদক-পরিচিতি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কবি, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে। লাতিন আমেরিকান সাহিত্য অনুবাদের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে হুয়ান রুলফো, গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজ প্রমুখের গল্প-উপন্যাস। অনুবাদ সাহিত্যের জন্য তিনি ভারতের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এটি পত্রের ভাষায় রচিত একটি অনুবাদমূলক গল্প। এতে ইসরায়েলের আক্রমণে বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনের মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু মুস্তাফাকে সম্বোধন করে লেখা এই চিঠিতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ছেড়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় মুস্তাফা প্রথমে কুয়েত ও পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায়। চিঠির লেখককেও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমন্ত্রণ জানায় মুস্তাফা। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর বিপন্ন ফিলিস্তিন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পত্রলেখক। কিন্তু করুণ এক অভিজ্ঞতা তাকে আমূল বদলে দেয়। সে ফিলিস্তিন ছাড়ার পূর্বে নিজের মা-ভাবির সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারে, তার নিহত ভাইয়ের মেয়ে নাদিয়া বোমার আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লেখক তাকে দেখতে যায়। নাদিয়ার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য বলে, তার চাওয়া অনেকগুলো লাল সালোয়ার সে নিয়ে এসেছে। সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেই নাদিয়া সেগুলো দেখতে পাবে। একথা শুনে নাদিয়ার চোখ ভিজে যায়। সাদা চাদর তুলে দেখায়, তার দুই পা কেটে ফেলা হয়েছে। এই দৃশ্য লেখকের মনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, ফিলিস্তিন ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। বন্ধুকেও আহ্বান করে দেশে ফিরে আসার জন্য।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ও সংকটাপন্ন স্বজনদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো অন্যদেশে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। এই গল্পের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে দেশ ও স্বজনের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব।

শব্দার্থ ও টীকা

ফিলিস্তিন — ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত, স্বাধীনতাকামী দেশ।

ক্যালিফোর্নিয়া — আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য।

শুকরিয়া — কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার।

কুয়েত — মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ।

মাইনে — বেতন।

কনট্রাক্ট — চুক্তি। ইংরেজি Contract.

দাবনা — ঊরুর ভেতরের দিকের মাংসের অংশ।

হালচাল — অবস্থা, দশা।

আগাপাশতলা — আগাগোড়া, আপাদমস্তক।

২০২৩

খুঁটিনাটি — সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয়।
আষ্টেপৃষ্ঠে — সর্বাঙ্গে।
পিছুটান — পেছনে ফেলে আসা কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ।
পার্থিব — পৃথিবী সংক্রান্ত।
উদ্‌বেল — উচ্ছলিত, আকুল হওয়া।
ধবধবে — অতিশয় উজ্জ্বল।
পশলা — বর্ষণ। এখানে 'অল্প পরিমাণ' অর্থে।
আর্তস্বরে — কাতর স্বরে, ব্যাকুল কণ্ঠে।
খেদ — দুঃখ, অনুতাপ, আক্ষেপ।
তন্নতন্ন — পুঙ্খানুপুঙ্খ, সমস্ত কিছু, আঁতিপাঁতি।
দপদপ — বেদনার ভাবপ্রকাশক শব্দ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. এই ফিলিস্তিনে সব কিছু দপদপ করছে বিষাদে, মনস্তাপে– কথাটি ব্যাখ্যা করো।
খ. পত্র লেখক ফিলিস্তিন ছেড়ে যায়নি কেন? 'ফিলিস্তিনের চিঠি' রচনার আলোকে তা ব্যাখ্যা করো।

২। ক. সেই যে প্রজন্ম বড়ো হয়ে উঠেছে পরাজয়, হতাশায় আর বাস্তুহীনতায়। কথাটি ব্যাখ্যা করো।
খ. 'ফিলিস্তিনের চিঠি' রচনার শিরোনাম 'ফিলিস্তিনের চিঠি' রাখাটা কতটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

তিরন্দাজ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সেকালে দিল্লির কাছে হস্তিনা নামে এক নগর ছিল। শান্তনু সেই হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন। একদিন শান্তনু যমুনার তীরে বেড়াইতে গিয়া অপরূপ সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। এই কন্যার নাম সত্যবতী। শিশুকাল হইতে এক ধীবর তাঁহাকে পালন করিয়াছিল। রাজা ধীবরের কাছে গিয়া তাঁহার পালিত কন্যাটিকে বিবাহ করিতে চাহিলেন।

ধীবর বলিল, 'মহারাজ, আপনার দেবব্রতের মতো সোনার চাঁদ ছেলে থাকিতে সত্যবতীর ছেলের রাজ্য পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই, কাজেই এই বিবাহে আমি মত দিতে পারি না।' দেবব্রত একদিন ধীবরের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আমার পিতার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন। ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রই রাজা হইবেন। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনো সিংহাসন দাবি করিব না।'

ধীবর বলিল, 'কুমার, এ প্রতিজ্ঞা আপনারই যোগ্য বটে; কিন্তু সিংহাসন লইয়া পরে আপনার পুত্রেরা যে গোলযোগ করিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কী?' তখন দেবব্রত বলিলেন, 'আচ্ছা, আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহও করিব না।' দেবব্রতের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁহার নাম হইল ভীষ্ম।

মহাসমারোহে রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহ হইয়া গেল। তারপর যথাক্রমে তাঁহাদের চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হইল। ভীষ্ম রাজ্যের সকল অধিকার ত্যাগ করিয়াও রাজকার্যের সমস্ত ভার আনন্দের সহিত বহন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য বড়ো হইলে অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালক্রমে এই দুই কন্যার দুইটি পুত্র হইল। অম্বিকার পুত্রের নাম হইল ধৃতরাষ্ট্র, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। আর অম্বালিকার পুত্রের নাম পাণ্ডু।

অন্ধ ছিলেন বলে ধৃতরাষ্ট্র পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইতে পারিলেন না। দেশের লোক পাণ্ডুকেই সিংহাসনে বসাইল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র খুবই দুঃখিত হইলেন। পাণ্ডুর বড়ো ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নামে তাঁহার আরও চারি পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ছেলে আর দুঃশলা নামে একটি মেয়ে ছিল। পাণ্ডু কুরুবংশের রাজা হইলেও তাঁহার ছেলেগুলিকে লোকে 'পাণ্ডব' বলিত আর ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলিত 'কৌরব'।

বড়ো হইলে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে বসিবেন, এ দুঃখ কি আর দুর্যোধন প্রভৃতির সহ্য হয়! ছেলেবেলা হইতেই পাণ্ডবদের প্রতি হিংসায় তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে পাণ্ডুর ছেলেদের সরল মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সুখী হইত। কিন্তু পাণ্ডবদের সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। অতি শিশুকালেই তাহারা পিতৃহীন হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতির অন্তর যে কত কুটিল, পাণ্ডবেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শিখিতে আরম্ভ করে। রাজকুমারগণ কৃপাচার্য নামে একজন শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ভীষ্মের কিন্তু বরাবর এই ইচ্ছা যে, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র সুবিখ্যাত দ্রোণাচার্যের ওপর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দেন।

ঘটনাক্রমে একদিন দ্রোণ নিজেই হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শহরের বাহিরে পৌঁছিয়াই দ্রোণ দেখিলেন, রাজবাড়ির ছেলেরা উৎসাহের সহিত একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছে। খেলিতে খেলিতে গোলাটা হঠাৎ এক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন সকলেই উহা উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইল না। আচার্য এই ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ছি ছি! ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইয়া তোমরা এই সামান্য কাজটা পারিলে না! এই দেখ, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি'—এই বলিয়া তিনি একটা শর লইয়া ওই গোলাতে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শরের পেছনে শর, তার পেছনে আর একটা শর—পরে পরে এইভাবে বিদ্ধ করিয়া শেষের শরটি ধরিয়া অক্লেশেই গোলা টানিয়া তুলিলেন। গোলা উঠান হইলে ব্রাহ্মণ কুয়ার মধ্যে নিজের আংটি ফেলিয়া তাহাও ওইরূপ কৌশলে উঠাইয়া আনিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সকলে তো অবাক!

দেখিতে দেখিতে এ খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের আশ্চর্য শক্তির কথা শুনিয়া ভীষ্মের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, স্বয়ং দ্রোণাচার্য আসিয়াছেন। কেননা, এ কাজ আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি মনে মনে এতদিন যাহা চাহিতেছিলেন, তাহাই হইল—দ্রোণ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর আচার্যকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া ভীষ্ম তাঁহার ওপর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিলেন। এরূপ আদর-যত্ন এবং হঠাৎ এতগুলি শিষ্য পাইয়া দ্রোণের তখন কী আনন্দ! তিনি বলিলেন, 'বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে এমন করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইব যে লোকের তাক লাগিয়া যাইবে। শেষে কিন্তু আমার একটি কাজ করিয়া দিতে হইবে।'

আচার্যের কথা শুনিয়া আর সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল অর্জুন বলিলেন, 'বলুন কী করতে হবে? আপনার আদেশ কখনও অমান্য করিব না।'

অর্জুনের কথায় প্রীত হইয়া দ্রোণ তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিলেন। তারপর চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'সে কথা পরে বলিব।' সেইদিন হইতে আচার্য অর্জুনকে ঠিক নিজের ছেলের মতো ভালোবাসিতে লাগিলেন।

যথারীতি ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হইল। রাজকুমারদের সহিত আর যাহারা দ্রোণের নিকট শিক্ষা পাইত, তাহাদের মধ্যে কর্ণই প্রধান। এই কর্ণকে লোকে অধিরথ সারথির ছেলে বলিয়া জানিত। কিন্তু বাস্তবিক সে যুধিষ্ঠিরের সহোদর—কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র। কর্ণের জন্মের পর কুন্তী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। কুন্তী যে কর্ণের মা, এ কথা আর কেহই জানিত না। কর্ণ নিজেও এ কথা অনেককাল পর্যন্ত জানিতে পারে নাই।

দ্রোণের শিক্ষাগুণে কয়েক মাসের মধ্যে সকলেরই খুব উন্নতি হইল। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন একজন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। গদায় দুর্যোধন ও ভীম এবং খড়্গে নকুল ও সহদেব খুব নাম কিনিলেন। আচার্যের মুখে অর্জুনের প্রশংসা আর ধরে না। তিনি মনে করিলেন, 'এই প্রিয় শিষ্যটিকে এমন-সকল কৌশল শিখাইব যে, পৃথিবীতে কেহই যেন ইহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারে।' আর সত্যই, কাজেও তিনি তাহা করিলেন।

অর্জুনের আদর দেখিয়া হিংসায় দুর্যোধন আর বাঁচে না। কর্ণ বরাবরই অর্জুনকে ঘৃণা করিত। এখন হইতে সেও দুর্যোধনের দলে যোগ দিয়া কথায় কথায় পাণ্ডবদের অপমান করিতে লাগিল।

এই সময় একদিন দ্রোণ কুমারগণের পরীক্ষার জন্য একটি নীলরঙের পাখি প্রস্তুত করিয়া গাছের ডালে বসাইয়া দিলেন। তারপর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওই যে পাখিটি দেখিতেছ, উহার মাথা লক্ষ্য করিয়া তির ছুড়িতে হইবে। মাথাটি কাটিয়া ফেলিতে পারিলে বুঝিব আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।'

এ কথায় চারিদিকেই উৎসাহের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রমে রাজকুমারগণ তির-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হইলেন। তখন দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি তুমি কী দেখিতেছ?' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'একটা পাখি দেখিতেছি।' দ্রোণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কী দেখিতেছ?' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'গাছের ডালপালা সবই দেখিতেছি, আপনাদের সকলকেও দেখিতেছি।'

এরূপ উত্তরে দ্রোণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; বলিলেন, 'না বাপু, এখনও তোমার নজরই ঠিক হয় নাই।'

ইহার পর তিনি এক-এক করিয়া প্রায় সকলকেই ডাকিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনের মতো উত্তর দিতে পারিল না। শেষে অর্জুনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বলো দেখি কী দেখিতেছ?' অর্জুন বলিলেন, 'আমি শুধু পাখির মাথা দেখিতেছি, আর কিছুই না।' এইবার দ্রোণের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, মাথাটি কাট দেখি।' আচার্যের মুখের কথা না-ফুরাইতেই অর্জুনের বাণে পাখির কাটা-মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আর একদিন দ্রোণকে কুমিরে ধরিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই কুমিরকে মারিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না-করিয়া যেন মহাবিপদেই পড়িয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। কুমারেরা ভয়ে একেবারে জড়সড়, কিন্তু অর্জুনের মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি তখনই কয়েকটা বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে দ্রোণ যে কীরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কী বলিব! তিনি অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া 'ব্রহ্মশিরা' নামে এক অস্ত্র পুরস্কার দিলেন। সে অতি ভয়ানক অস্ত্র। তাহার তেজে স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপিয়া ওঠে। মানুষের ওপর সে অস্ত্র ছাড়িতে আচার্য কিন্তু অর্জুনকে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও কিছুদিন চলিয়া গেল। ক্রমে সকলেই এক-একজন বীর হইয়া উঠিলেন। এইবার দশজনের সাক্ষাতে কুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনের সময় উপস্থিত।

দ্রোণের পরামর্শে অন্ধরাজ প্রকাণ্ড এক রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইলেন। উহার মাঝখানে খেলিবার স্থান এবং চারিদিকে রাজা-রাজড়া ও বড়ো বড়ো বীরদিগের বসিবার জন্য সুন্দর সুন্দর মঞ্চ। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র আসন। বিচিত্র পত্র-পুষ্পে, নিশান-ঝালরে সমুদয় রঙ্গভূমি ঝলমল করিতে লাগিল।

আগেই দেশে দেশে ঢোল পিটাইয়া এ সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার দিন রঙ্গভূমি একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাহাদের কোলাহলে ও বাদ্যের শব্দে সারা দেশ মাতিয়া উঠিল।

যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর প্রমুখ সভায় প্রবেশ করিলেন। তারপর মান্য ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল। ক্রমে মহিলাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষে দেশ-বিদেশের ছোটো-বড়ো কেহই আর আসিতে বাকি থাকিল না। সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে, আচার্য দ্রোণ শ্বেতবসনভূষণে সজ্জিত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

কুমারগণ সারি বাঁধিয়া দলে দলে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সাজসজ্জা আর অস্ত্রের চাকচিক্যে চারিদিকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জয়ধ্বনি ও বাদ্য-কোলাহল থামিলে দুর্যোধন আর ভীম গদাহস্তে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের চালচলন ও যুদ্ধের কৌশল কী সুন্দর! কিন্তু কিছুক্ষণ খেলিতে খেলিতে উভয়ে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, দ্রোণাচার্য ভয় পাইয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

গদা-খেলার পর কুমারগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া নকল যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। শেষে আসিলেন অর্জুন। যেমন বীরের ন্যায় চেহারা, তেমনি তাঁহার হাতের কায়দা। তিনি অগ্নিবাণে চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, বরুণবাণে তখনই আবার তাহা নিভাইয়া ফেলিলেন; এক বাণে আকাশে বায়ু ও মেঘের সৃষ্টি করিলেন, এক বাণে বিশাল পর্বত গড়িলেন, এক বাণে নিজেই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া পর-মুহূর্তেই আবার বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাণে কখনও রৌদ্র, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি—যেন বাজিকরের ভেলকি! লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল। শেষে অর্জুন এক বাণে আপনাকে এমন করিয়া লুকাইলেন যে, কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। আশ্চর্য শিক্ষা!

অর্জুনের জয়ধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।

লেখক-পরিচিতি

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক ও প্রকাশক, কিন্তু শিশুসাহিত্য রচনা ছিল তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য। তরুণ বয়সেই 'সখা', 'সখী', 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক' প্রভৃতি শিশুপত্রিকায় লিখে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর উদ্ভট বিষয়বস্তুর ছড়াগুলো ছোটোদের আনন্দের জন্য অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁর রচিত সচিত্র 'হাসি ও খেলা' বইটি বাংলায় প্রথম শিশুতোষ বই। যোগীন্দ্রনাথের অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে 'খুকুমণির ছড়া', 'ছবি ও গল্প', 'রাঙা ছবি', 'হাসিখুশি', 'হাসিরাশি', 'বনে জঙ্গলে', 'পশুপক্ষী' 'ছোটোদের মহাভারত' প্রভৃতি। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পাংশটি ছোটোদের জন্য লেখা মহাভারতের 'আদিপর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পের মূল বিষয় পাণ্ডু ও কুরুর সন্তানদের মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। অস্ত্রবিদ্যার গুরু দ্রোণাচার্য হস্তিনাপুর এলে ভীষ্ম তাঁকে রাজকুমারদের শিক্ষক হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেন। দ্রোণাচার্যও ততোধিক স্নেহ ও সযত্নে কুমারদের যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন। রাজকুমার অর্জুন তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়ে ওঠেন। এতে কর্ণ ও দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের প্রতি রুষ্ট হন। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অর্জুনের পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ হিসেবে দ্রোণাচার্য তাঁকে 'ব্রহ্মশিরা' অস্ত্র পুরস্কার দেন। এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে রণক্ষেত্রে রাজকুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনী হলে সবাই যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। অর্জুনের রণকৌশল সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। আগ্রহ, চর্চা, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি মানুষকে যেকোনো কঠিন কাজে যে পারদর্শী করে তুলতে পারে, এখানে তা-ই ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

তিরন্দাজ	— তির ছুড়ে যে।
দ্রোণাচার্য	— মহাভারতের কুরুবংশের গুরু বা শিক্ষক। ইনি অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। অন্যনাম, দ্রোণ।
অস্ত্রশিক্ষা	— অস্ত্র চালানোর বিদ্যা বা জ্ঞান।
ক্ষত্রিয়	— জাতি বিশেষ। হিন্দু বর্ণভেদ অনুযায়ী চার বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ বা জাতি।
ধনুর্বিদ্যা	— ধনুক চালানোর বিদ্যা বা জ্ঞান।
আঁটিয়া	— পেরে ওঠা।
মুনি	— ঋষি। যারা ধ্যানে মগ্ন থাকেন।
হস্তিনা	— কৌরবদের রাজধানী।
গোলা	— লোহা দিয়ে বানানো গোল আকৃতির এক ধরনের অস্ত্র। কামান বা বন্দুক থেকে তা নিক্ষেপ করা হয়।
ভীষ্ম	— মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের পিতামহ বা দাদা।
আচার্য	— শিক্ষক। যিনি শাস্ত্র অনুযায়ী শিক্ষা দেন।

সারথি — রথচালক।
কুন্তী — পাণ্ডবদের মা।
গদা — এক ধরনের অস্ত্র। শক্ত ও মোটা লাঠি, মুগুর।
খড়্গ — কাটা যায় এমন ভারি ও ধারালো শস্ত্র; খাঁড়া।
বাণ — ধনুক থেকে ছোড়ার এক ধরনের অস্ত্র। তির, শর।
রঙ্গভূমি — অভিনয়ক্ষেত্র, মঞ্চ।
লোকারণ্য — লোকে ভরপুর। প্রচুর লোকসমাগম হয় যেখানে।
শ্বেতবসনভূষণ — সাদা রঙের পোশাকে সজ্জিত।
কৃপ — কুরুপাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু। অন্য নাম কৃপাচার্য।
বিদুর — মহাভারতের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভাই।
বরুণবাণ — এক ধরনের অস্ত্র। পানি দিয়ে তৈরি অস্ত্র।
বাজিকর — জাদুকর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. ‘পাণ্ডবদের সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল কেন?’ ব্যাখ্যা করো।

খ. আগ্রহ, চর্চা, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি মানুষকে যেকোনো কাজে পারদর্শী করে তোলে— মন্তব্যটি ‘তিরন্দাজ’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২। ক. ভীষ্ম কীভাবে বুঝতে পারলেন স্বয়ং দ্রোণাচার্য এসেছেন? বুঝিয়ে লেখো।

খ. ‘তিরন্দাজ’ গল্পের শিরোনাম ‘তিরন্দাজ’ রাখাটা কতটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নাটক

মানসিংহ ও ঈসা খাঁ

ইব্রাহীম খাঁ

[স্থান : এগারোসিন্ধুর পরপারে মহারাজ মানসিংহের শিবির।
চরিত্র : মানসিংহ, দুর্জয়সিংহ ও দূত]

মানসিংহ : শোনা যায়, একদা এক অসুররাজ গোষ্পদে ডুবে মরেছিল। একথা বিশ্বাস করো, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : এ পুরাণের কাহিনিমাত্র। বিশ্বাস করি না!

মানসিংহ : আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না, দুর্জয়সিংহ, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

দুর্জয়সিংহ : সত্যি বিশ্বাস করেন, মহারাজ?

মানসিংহ : চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দুর্জয়সিংহ, তাতে বিশ্বাস না-করি কেমনে, তাই বলো। নইলে বাংলার এক অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র পাঠানসর্দার ঈসা খাঁ, তারই তলোয়ারতলে মারা যায় ক্ষত্র-বীর মানসিংহের আপন জামাতা?

দুর্জয়সিংহ : আশ্চর্যই বটে!

মানসিংহ : মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন তো সে মরতই—না-হয় দুদিন আগে মরেছে। কিন্তু রাজপুতনার মরুসিংহ মারা গেল বাংলার বকরির হাতে—এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : মহারাজ, এ দুঃখ করতে পারেন।

মানসিংহ	:	জামাতা নিহত হয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো দুঃখ যে, এই কাহিনি শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, শত্রুরা উপহাস করে রটনা করবে, আমি নিজে ভয় পেয়ে ঈসা খাঁর সামনে আমার জামাতাকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।
দুর্জয়সিংহ	:	এ বিধাতার বিধান, মহারাজ, সয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী?
মানসিংহ	:	না। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব—আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব।
দুর্জয়সিংহ	:	কিন্তু সে কী করে সম্ভব হবে?
মানসিংহ	:	ঈসা খাঁ আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল, পাঠিয়েছিলাম আমার জামাতাকে। আমার জামাতাকে হত্যা করে ভেবেছে, সে বুঝি মানসিংহকেই হত্যা করেছে। আমি তাকে জানিয়েছি, ঈসা খাঁর মুণ্ডপাত করার জন্য মানসিংহ এখনও জীবিত রয়েছেন। এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গিয়েছে আমার তরফ থেকেই।
দুর্জয়সিংহ	:	কোনো উত্তর পেয়েছেন?
মানসিংহ	:	না, তবে এক্ষুনি পাব। জানি না; সে কাপুরুষ পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হবে কিনা।
দূত	:	(প্রবেশান্তে কুর্নিশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক!
মানসিংহ	:	কি সংবাদ, দূত?
দূত	:	সংবাদ শুভ। মহারাজকে হত্যা করেছে ভেবে তারা উৎসব করছিল; এমন সময় আপনার আহ্বান নিয়ে আমি হাজির! তবে ঈসা খাঁ এ আহ্বান গ্রহণ করেছেন।
মানসিংহ	:	গ্রহণ করেছেন? অনেকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই?
দূত	:	না মহারাজ! তক্ষুনি গ্রহণ করেছেন।
মানসিংহ	:	তক্ষুনি? আচ্ছা, তা বেশ। কোনো জবাব এনেছ?
দূত	:	এনেছি, মহারাজ! তবে দেখাতে সাহস হয় না।
মানসিংহ	:	তোমাকে অভয় দিচ্ছি, দূত।
দূত	:	মহারাজ, ঈসা খাঁ লোকটা, নিতান্ত... নিতান্ত... এই নিতান্ত...
মানসিংহ	:	নিতান্ত কী?
দূত	:	আজ্ঞে, নিতান্ত গোঁয়ার। কারণ মহারাজের আহ্বানপত্র পেয়েই অমনি তলোয়ার খুললেন, তারপর নিজের হাত কেটে তারই রক্তে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তর লিখলেন—‘বহুত আচ্ছা’।

২.

[স্থান : লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে পাঠান শিবির, অন্যদিকে মোগল শিবির। অদূরে এগারোসিন্ধুর কেল্লা—ময়দানের মাঝখানে ঈসা খাঁ ও মানসিংহ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।]

ঈসা খাঁ	:	নমস্কার, মহারাজ।
মানসিংহ	:	আদাব, খাঁ সাহেব।
ঈসা খাঁ	:	এত তকলিফ করে এখানে না-এসে মহারাজ যদি আদেশ করতেন, তবে দিল্লিতে গিয়েই মহারাজের সঙ্গে আমি একহাত লড়ে আসতাম।

মানসিংহ : বাংলার ঝোপে-জঙ্গলে আপনারা কেমন আছেন, একটু দেখতে শখ হলো, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ : রাজপুতনার মরু-পর্বতের কোন অন্ধকার গুহায় মহারাজ কীরূপে থাকেন, তা দেখবার কৌতূহলও তো এ বান্দার হতে পারত!

মানসিংহ : পাঠানেরা দেখছি ইদানীং কথা বলতে শিখেছে।

ঈসা খাঁ : এ আপনাদের মতো কথা-সর্বস্বদের সঙ্গে থাকার ফল। আগে পাঠানেরা কথা বলত না; কথা বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।

মানসিংহ : ইদানীং বুঝি তাহলে পাঠানদের তির-তলোয়ার ভোঁতা হয়ে পড়েছে!

ঈসা খাঁ : শাহি ফৌজের ওপর ক্রমাগত ব্যবহারে একটু ভোঁতা হয়েছে বৈকি!

মানসিংহ : তাহলে এখন তলোয়ার ছেড়ে কাবুলি মেওয়ার কারবার শুরু করলে হয় না, খাঁ সাহেব?

ঈসা খাঁ : কিন্তু কাবুলি মেওয়া এখানে খাবে কে? মহারাজের তো বাজরার খিচুড়ি আর ঘাসের রুটি খেয়ে খেয়ে পেট এমনি হয়েছে যে, কাবুলি আঙুরের গন্ধেই বমি আসে।

মানসিংহ : কিন্তু খাঁ সাহেব কি কেবল কথার যুদ্ধের জন্যই তৈয়ার হয়ে এসেছেন, না আরও কোনো মতলব আছে?

ঈসা খাঁ : সে সম্পূর্ণ মহারাজের অভিরুচি। ঈসা খাঁ যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে যে কোনো অস্ত্রে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।

মানসিংহ : মনে হচ্ছে, শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করে ঈসা খাঁর অহংকার বেড়েছে। কিন্তু ঈসা খাঁ কেবল ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নাই।

ঈসা খাঁ : কিন্তু ফাঁদের সঙ্গে যে এ বান্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটেছে—এই মাত্র সেদিন—সে তো মহারাজের অজানা থাকবার কথা নয়।

মানসিংহ : সে কথা জানি, কাপুরুষ। আমার জামাতা—এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক—বাগে পেয়ে তাকে তুমি হত্যা করেছ।

ঈসা খাঁ : খবরদার মানসিংহ। ঈসা খাঁকে 'কাপুরুষ' বলে কেউ কোনোদিন রেহাই পায় নাই। আর ঈসা খাঁ নিজে পর্দার আড়ালে থেকে জামাতাকে কখনও লড়াইয়ে পাঠায় নাই। কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করছি—সেই মহান যুবকের নামে, যিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে সমর শয্যা গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : ভূতের মুখে রাম নাম! কিন্তু আত্মরক্ষা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : তুমিও আত্মরক্ষা করো মানসিংহ।

[যুদ্ধ শুরু হইল : লড়িতে লড়িতে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার ভাঙিয়া পড়িয়া গেল—নিরস্ত্র মানসিংহ ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

ঈসা খাঁ : এখন মহারাজকে রক্ষা করবে কে?

মানসিংহ : কেউ না; তুমি আমাকে হত্যা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : না, মহারাজ, সে হয় না। নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।

মানসিংহ : তবে আমাকে বন্দি করো, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না।

ঈসা খাঁ : তাও হয় না মহারাজ। আপনার মতো সাহসী যোদ্ধাকে বাগে পেয়ে আমি বন্দি করব না। এই নিন আমার তলোয়ার—যুদ্ধ করুন।

[নিজ তলোয়ার মানসিংহের হাতে তুলিয়া দিয়া বাম কটি হইতে অন্য তলোয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলেন।]

মানসিংহ : [একটু ভাবিয়া তলোয়ার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন] আমি লড়ব না।

ঈসা খাঁ : কেন, মহারাজ?

মানসিংহ : আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই।

ঈসা খাঁ : বটে।

মানসিংহ : ঈসা খাঁ, চমৎকার। দূর হতে তোমার কত নিন্দাই শুনেছি, ভাই কাছে এসেও এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নাই। আজ তোমার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হলো, এই-ই আমার পরম লাভ! তোমাকে চিনবার আগে মরলে মানসিংহের জীবনে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যেত।

ঈসা খাঁ : মহারাজ—ভাই—তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও ধন্য।

মানসিংহ : তবে, এসো ভাই! [আলিঙ্গন] আমাদের এই আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে মোগল-পাঠানের বন্ধুত্ব হোক, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক আর কখনো আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র বক্ষ কলঙ্কিত করব না।

লেখক-পরিচিতি

ইব্রাহীম খাঁ-র জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলের এক কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। সারা বাংলায় তিনি প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ নামে পরিচিত। অসাধারণ অনেক ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনি ও শিশুসাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' প্রভৃতি নাটক; 'আলু বোখরা', 'দাদুর আসর' গল্পগ্রন্থ; 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' ভ্রমণ-কাহিনি। বাংলা নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ইব্রাহীম খাঁ ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

ইব্রাহীম খাঁ এই নাট্যাংশে হাজির করেছেন ঈসা খাঁ ও রাজপুত বীর মানসিংহের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহানুভবতার কাহিনি। বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন মানসিংহের বীর জামাতাকে। প্রতিশোধ নিতে মানসিংহ এগারোসিন্ধু ময়দানে ঈসা খাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ঈসা খাঁ বীরত্বের সঙ্গে তা গ্রহণও করেন। যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঈসা খাঁ নিরস্ত্র মানসিংহকে আঘাত না করে তাঁর হাতে অপর একটি তলোয়ার তুলে দেন। ঈসা খাঁর বীরত্ব ও ঔদার্যে মানসিংহ বিস্মিত হয়ে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে জানান, ঈসা খাঁর সঙ্গে তাঁর কোনো যুদ্ধ নেই। তারপর দুই বীর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দুজনেই ভারতের মোগল-পাঠান আর হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব ও মিলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নাট্যাংশটিতে মোগল-ভারত আমলের বীরত্ব, মহানুভবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের উদারতা ও মহানুভবতা।

শব্দার্থ ও টীকা

এগারোসিন্ধু — কিশোরগঞ্জের একটি নদী।
মানসিংহ — রাজপুত বীর।
ঈসা খাঁ — পাঠান বীর। বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন।
দুর্জয়সিংহ — মানসিংহের সহচর।
অসুররাজ — অসুরদের রাজা।
গোষ্পদ — গরুর খুরের চাপে তৈরি গর্ত।
ক্ষত্র-বীর — ক্ষত্রিয় বীর।
বকরি — ছাগল।
মেওয়া — ফল বিশেষ।
বাজরা — শস্য বিশেষ।
রাজপুতনা — ভারতের রাজস্থানের অপর নাম।
কুর্নিশ — মাথা নত করা।
আহ্বানপত্র — দাওয়াত লিপি।
ডগা — অগ্রভাগ।
বহুত আচ্ছা — খুব ভালো।
তকলিফ — কষ্ট।
কথাসর্বস্ব — কথাই সার যেখানে।
ফাঁদ — কৌশল, ছল। পশুপাখি ধরার যন্ত্রবিশেষ।
ওয়ার — আঘাত।
অনুগ্রহ — দয়া।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. ‘আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব– আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব’– মানসিংহ কেন এ কথা বললেন? ব্যাখ্যা করো।
খ. ‘না, মহারাজ, সে হয় না। নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।’– এ উক্তিতে ঈসা খাঁর যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

২। ক. ‘পাঠানেরা দেখছি ইদানীং কথা বলতে শিখেছে’– কথাটি ব্যাখ্যা করো।
খ. ‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের মূল শিক্ষা কী? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো।

ভ্রমণ-কাহিনি

কাবুলের শেষ প্রহরে

সৈয়দ মুজতবা আলী

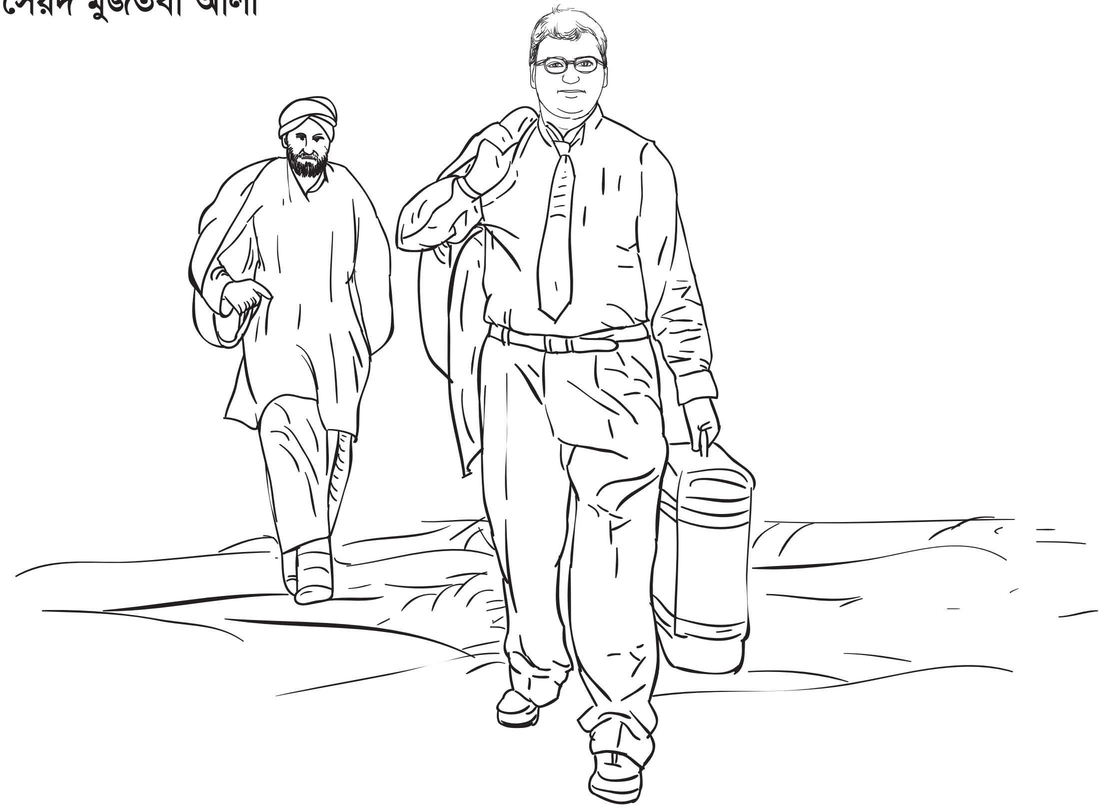

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মামলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল। মৌলানা এসে বললেন, চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পাউন্ড লাগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কী রাখি, কী নিয়ে যাই?

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারদিকে তাকালাম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কী, আর রেখে যাব কী?

ওই তো আমার দু ভল্যুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাশখন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তারপর খেয়া পেরিয়ে, খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্তান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-উতরাই ভেঙে এসে পৌঁছেছে কাবুল। ওজন পাউন্ড ছয়েক হবে।

ভুলেই গিয়েছিলাম। এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মতো রং আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভেতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটোখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দিনের প্রদীপ।

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা।

মৌলানা তার এক পাঞ্জাবি বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার ওপর অনেকবার খামোখা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু-হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের ওপর চেপে ধরল। ভেজা। আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কী করছ? আর শোনো, যা রইল সবকিছু তোমার।'

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলাম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশি দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালাম। এই নীরস নিরানন্দ বিপদসংকুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে লোকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককে অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছে যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হলো আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসিতে বলে 'পার্তিও সে তাঁ প্য মুরির', প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বরে ওজন করা হলো। কারো পোটলা দশ পাউন্ডের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, কই তেমন কিছু খাপসুরত অ্যাপোলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরোবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথ্যা নয়।

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পাউন্ডের পুঁটুলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র‍্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কি একটা বিড়বিড় করল। বুঝলাম, সে ওই র‍্যাকেটখানাকেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মতো। তার বিশ্বাস স্ক্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলাম, র‍্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থানে যাবে।

দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়ো, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড্ করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং আই উইশ এ গুড জার্নি।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলব।'

সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্তানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব্ আমানে খুদা'—'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলাম', যে যাচ্ছে না সে বলে 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ'—'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলাম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললাম, 'ব্ আমানে খুদা, আবদুর রহমান', আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ-দুর্দিনে যে টেনিস র‍্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান'।

লিগেশনের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পাউন্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সাহেব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ওই একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমৎ।'

প্রপেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারস্বরে চিৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার কাছে সে বারবার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলাম, 'সপুর্দমৎ'। আফগানিস্তানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে কয়টা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব কয়টাই উত্তীর্ণ হলো। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও' বলে আপন সিটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর এয়ারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হলো চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের করিমগঞ্জ (বর্তমান ভারতের কাছাড়) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট সরকারি স্কুলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি। সৈয়দ মুজতবা আলীর কর্মজীবন শুরু হয় আফগানিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে। সৈয়দ মুজতবা আলী ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। তিনি বাংলা গদ্যে হাস্যরসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'শবনম' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

বর্তমান অংশটি লেখকের বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনি 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত অংশবিশেষ। আফগান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কাজ করার সময় লেখক কাবুলে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর গৃহপরিচারক আবদুর রহমানের সঙ্গে গড়ে ওঠে এক গভীর মানবিক সম্পর্ক। গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের দেখভালের প্রতিও আবদুর রহমানের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিছুদিন পর কাবুলে হঠাৎ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খাবার-দাবারসহ নিরাপত্তারও সংকট দেখা দেয়। এ সংকটে লেখক ও আবদুর রহমান অল্প খাবার ভাগ করে খেতেন। এ পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসার জন্য লেখক বিমানের একটি আসন লাভ করেন। বিমানবন্দরে আবদুর রহমানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তানে লেখকের উচ্চপদস্থ বহু বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আবদুর রহমানকেই পরম বান্ধব বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মানুষের প্রতি ভালোবাসার সত্যিকারের প্রকাশ জাতি বা শ্রেণিতে আবদ্ধ থাকে না– তা সর্বদেশের, সর্বকালের।

শব্দার্থ ও টীকা

মামলেট	– অমলেট। ডিম ভাজা। ইংরেজি Omelette।
পনির	– লবণাক্ত জমাট বাঁধা ছানা।
কার্পেট	– গালিচা। ইংরেজি Carpet.
ভল্যুম	– বইয়ের খণ্ড। ইংরেজি Volume.
রাশান	– রুশ। ইংরেজি Russian.
তাশখন্দ	– তৎকালীন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর। বর্তমানে উজবেকিস্তানের রাজধানী।
আমুদরিয়া	– তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী।
খচ্চর	– ঘোড়া ও গাধার মতো পশু।
হিন্দুকুশ	– আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালা।
চড়াই-উতরাই	– উঁচু-নিচু।
পাণ্ডুলিপি	– হাতে লেখা কাগজ বা গ্রন্থ।
ভাজ	– ফুলদানি। ইংরেজি Vase.

আলাউদ্দিনের প্রদীপ – আরব্য রজনীর কাহিনিতে উল্লেখিত আশ্চর্য প্রদীপ। এই প্রদীপের সাহায্যে এক দৈত্যের মাধ্যমে যে কোনো কিছু করতে পারা যায়।

পাঞ্জাবি – পাঞ্জাব অঞ্চলের মানুষ।

হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি – বিমানবন্দর।

বিপদসংকুল – বিপদে পরিপূর্ণ।

পুরী – প্রাসাদ, আবাসস্থল বা থাকার জায়গা।

হৃদ্যতা – বন্ধুত্ব।

গুণী – পণ্ডিত মানুষ। এখানে বিদ্রূপ অর্থে।

খাপসুরত – অত্যন্ত সুন্দর। ফারসি ‘খাপ’ ও আরবি ‘সুরত’ শব্দের মিলিত রূপ।

র‍্যাকেট – টেনিস খেলার ব্যাট। ইংরেজি racket.

অপটিমাম – সহজে খোলা যায় এমন অবস্থা। ইংরেজি Optimum.

প্রেসে বাঁধা – র‍্যাকেট বাঁকা না হওয়ার জন্য স্ক্রু দিয়ে একটি ফ্রেমে চেপে বেঁধে রাখা। ইংরেজি press.

ছোটাসে ছোটা – ছোটোর চেয়ে ছোটো।

নড্ – সামনের দিকে মাথা নত করে অভিবাদন জানানো। ইংরেজি Nod.

ভোঁতা – ধারহীন। এখানে ‘চালাক নয়’ অর্থে।

ঘড়েল – পাকা, সুচতুর।

ডিপ্লোম্যাট – কূটনীতিক। রাষ্ট্রদূত। ইংরেজি Diplomat.

লিগেশন – দূতাবাসের কর্মকর্তা। ইংরেজি Legation.

প্রপেলার – ইঞ্জিনের পাখা। ইংরেজি propeller.

তারস্বরে – অতি উচ্চ শব্দে।

ব্যসনে – দুঃখে, কষ্টে।

রাষ্ট্রবিপ্লব – এখানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের কথা বলা হয়েছে।

চাণক্য – প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ।

ন্যাজ – লেজ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ক. আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে– কথাটি ব্যাখ্যা করো।

খ. মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ জাতি বা শ্রেণিভেদে আবদ্ধ থাকে না– মন্তব্যটি ‘কাবুলের শেষ প্রহরে’ ভ্রমণ-কাহিনির আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সমাপ্ত

২০২৫

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি : আনন্দপাঠ

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।